সারস্বতকুঞ্জ।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

Vita Sine literis mors est.

কলিকাতা।

৩৪।১ নং কলুটোলাষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম প্রেসে

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

মূল্য ৸৵০ আনা মাত্র।

অবতরণিকা।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর এবং মাসিক সমালোচকে সময়ে সময়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই রীতি এক্ষণে সকল লেখকই অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং আমি ইহা অবলম্বন করিলাম বলিয়া কোন কৈফিয়ৎ বোধ হয় আমাকে দিতে হইবে না।

প্রবন্ধগুলি প্রথমে যেরূপ বাহির হইয়াছিল, এক্ষণেও প্রায় সেইরূপই থাকিল। স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কিঞ্চিৎ মাত্র। কোথাও অনবধানবশতঃ বক্তব্য কথা যথাযথ পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করা যায় নাই; কোথাও আমি যাহা বলিয়াছি, ভাষার দোষে হয় ত পাঠক অন্যরূপ বুঝিয়াছেন; কোথাও দ্রুতরচনা নিবন্ধন ভাষার শিথিলতা এবং ভাবের অস্পষ্টতা জন্মিয়াছে; এই সকল স্থলে মাত্র কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছি। আর সব, যাহা ছিল, তাহাই থাকিল।

এই গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে গুটি দুই কথা বলিবার আছে। "সতীদাহ" শির্ষক প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ হইলে পর, উহার একটী প্রতিবাদ বঙ্গদর্শনেই বাহির হয়। এই প্রতিবাদ পাঠ করিয়া আমি বড় উপকৃত হইয়াছি। উপরে যে অপরিষ্কৃতি, শিথিলতা এবং অস্পষ্টতার উল্লেখ করিলাম, এই প্রতিবাদে সেই-রূপ কয়েকটি স্থলে আমার চক্ষু আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রতিবাদকারী সে উপকারের জন্য আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। যদিও প্রতিবাদ পড়িয়া আমার মতামত পরিবর্ত্তনের কোন কারণ দেখি নাই এবং মতামত পরিবর্ত্তন করি নাই, তথাচ যে উপকার টুকুর কথা বলিলাম, তজ্জন্য প্রতিবাদকারীকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। উপকার, উপকার—ইহার আর ছোট বড় কিছু নাই। ইতি।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

উৎসর্গ।

সুহৃদ্প্রধান

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তকে

এই গ্রন্থ

প্রণয়োপহার

প্রদত্ত

হইল।

গ্রন্থকারস্য।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
রামবসুর বিরহ	১
সতীদাহ	১৩
মৃন্ময়ী	২৭
রসসাগর	৩৭
বাঙ্গালির কল্পনাপ্রিয়তা	৪৮
পশুপূজা	৬১
যৌননির্ব্বাচন	৭৫
বঙ্গে ধর্ম্মভাব	৯০
ভার্গববিজয়	১০৮
বাঙ্গালির জন্য নূতন ধর্ম্ম	১২২

সারস্বত কুঞ্জ।

রাম বসুর বিরহ।

রাম বসুর বিরহসংগীত বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র খ্যাত। জানা শুনা লোকের মধ্যে বিরহসংগীতের কথা উঠিলেই রাম বসুর নাম হয়। রাম বসুর নাম এ প্রকার প্রসিদ্ধ হইবার উপযুক্তও বটে। রাস্নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকার (কেষ্টা মুচি), লালু নন্দলাল, নীলমনি পুটুনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাতু রায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবিওয়ালাদিগের যত সংগীত আমরা অবগত আছি, তন্মধ্যে রাম বসুর গানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমাদের বোধ হয়। ইহাঁর গানের ভাব যেমন স্বাভাবিক, সময়োপযোগী এবং সুন্দর, শব্দবিন্যাসও তেমনি প্রাঞ্জল, সুকৌশলসম্পন্ন, সুতরাং পরিপাটী ও মনোহর। কিন্তু দুঃখের বিষয়—লজ্জার বিষয়ও বটে—দুঃখের বিষয় এই যে, রাম বসুর নাম যত লোকে জানে, তাহার পনর আনা লোকই বোধ হয়, রাম বসুর একটি গানও কখন কর্ণে শুনে নাই বা চক্ষে দেখে নাই। দুই চারি জন বোধ হয় দুই একটা গানের দুই চারি ছত্র অবগত আছেন। এই সকল লোকের মুখে রাম বসুর যে প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীনদিগের প্রশংসার প্রতিধ্বনি মাত্র।

রাম বসু যে কেবল বিরহসংগীতই রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ নহে। তাঁহার রচিত আগমনী এবং সখিসংবাদও অনেক আছে। কিন্তু বিরহের জন্যই ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাস্তবিকও ইহাঁর

বিরহসংগীতগুলি যেমন মনোহর, অন্যবিধ গান তেমন নহে। এই স্থলে ইহাও বলিতে হয় যে, বিরহসংগীতেরও সকলগুলি সমান নহে। দুই একটা এমনও আছে যে, তাহা রাম বসুর রচিত বলিতে দুঃখ বোধ হয়, লজ্জা করে। কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, আকাশের সকল নক্ষত্রই কিছু শুকতারা নহে, কাননের সকল কুসুমই কিছু কানন আলো করে না, সরভাণ্টিসের সকল গ্রন্থই কিছু 'ডন্ কুইক্সোট্' নহে, শেক্ষপীয়রেরও সকল নাটক কিছু হ্যাম্লেট্, ওথেলো নহে। সাধারণ কথায় বলে, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান হয় না।

রাম বসুর গানের ভাব ও শব্দবিন্যাস-কৌশল, উভয়েরই আমরা প্রশংসা করিয়াছি। মোটামুটি এরূপ প্রশংসা করা যায়। কিন্তু আঁটাআঁটি করিয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম সমালোচনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইহাঁর ভাবপারিপাট্য অপেক্ষা রচনাচাতুর্য্য অধিকতর জাজ্বল্যমান,—ভাবুকতা অপেক্ষা মুন্সিগিরি অধিক—কথার বাঁধুনি, কথার গাঁথনি যেমন, ভাবের মনোহারিতা, ভাবের চমৎকারিতা তদ্রূপ নহে। সুতরাং ইহাঁর বিরহিণীদিগের বিরহসংগীত শুনিয়া 'বাহবা' দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু 'আহা' কথাটা মুখে আসে না।

রাম বসুর বিরহসংগীতে যেরূপ বিরহের বর্ণনা, তাহাকে আমরা বিরহ না বলিলেও না বলিতে পারি। এ বিরহ, না প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের বিরহ, না অধুনাতন নাটকোপন্যাসলেখকদিগের বিরহ। ইহাতে ব্যাকুলতা নাই, আত্মবিস্মৃতি নাই, স্মৃতিদংশন নাই, মর্ম্মদাহ নাই, তন্ময়ত্ব নাই। ইহাতে হাহাকার নাই, চক্ষের জল নাই, ভূপতন নাই, মূর্চ্ছা নাই, মৃত্যু নাই। আছে কেবল প্রগল্ভার বাক্চাতুরী। তীব্র ব্যঙ্গ এবং অগ্নিময় শ্লেষ ইহার প্রাণ। ইহার নায়িকারা—নায়কের উক্তি বিরহ বড় বিরল—বিরহপীড়িতা হইয়া উষ্ণনিশ্বাসে এবং উষ্ণতর অশ্রুপাতে প্রেমতর্পণ করেন না; নায়কের দেখা পাইলে বাক্যবিষে তাঁহাকে দগ্ধ করেন। যখন বিরস মলিন মুখে আপনার হৃদ্গত দুঃখের কথা ব্যক্ত করেন, তখনও যেন নয়নপ্রান্তে শ্লেষপরায়ণার ঈষৎ তীব্র হাসি, আকাশপ্রান্তে ক্ষীণ

বিদ্যুতের ন্যায়, খেলিতে থাকে,—বিদ্যুতের ন্যায়, সে ক্ষীণ হাসিরও দাহিকা শক্তি আছে। যখন বহুদিনের অদর্শনের পর দৈবযোগে বাঞ্ছিতের দেখা পাইয়া প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য মিনতি করিয়া বলেন ;—

"দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ,
হলো এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা,
তোল ও বিধু বদন॥"

তখনও সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ—

"পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমনতো প্রেমভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি।"

আমরা বলি, ইহার অপেক্ষা দু ঘা মারা বরং ভাল।

এই সকল বিরহসংগীতে যে প্রকার প্রেম পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা প্রেমের আদর্শ নহে, কেন না তাহা পবিত্র নহে। ইহার অধিকাংশ নায়িকাই পরকীয়া নায়িকা, সুতরাং ইহাদিগের প্রেম আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসকলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র। যে দুই একটী গানের নায়িকা পরকীয়া নহেন, তাঁহাদেরও তাই। ইহাঁদের যত জ্বালা, কেবল যৌবনজনিত, বসন্তজনিত, স্মরশরজনিত। ইহাঁদের দুঃখ —

—"যৌবন রসের, ভার অতি ভার,
নারী নারি আর বহিতে।"

ইহাঁদের দুঃখ—

"যৌবন জনমের মত যায়,
সে তো আসাপথ নাহি চায়।"

ইহাঁদের অনুযোগ—

"একে আমার এ যৌবন কাল,
তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল॥"

তাই বলিতেছিলাম, যে ইহা প্রেমের উচ্চ আদর্শ নহে। যে প্রেম আত্মনিগ্রহরত, আত্মবিস্মৃত, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেমে মনুষ্য আত্মসুখদুঃখ ভুলিয়া যায়, জগৎ সংসার ভুলিয়া যায়, আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেম প্রলোভনে পরীক্ষিত, দুঃখে দৃঢ়ীকৃত, অদর্শনে অবিচলিত, অনাদরে অক্ষুণ্ণ এবং কালস্রোতে অপরিশ্রান্ত, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেম আত্মায় আত্মায়, হৃদয়ে হৃদয়ে, যে প্রেমের সৌরভ বৈকুণ্ঠধাম পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, যে প্রেমে মানুষকে দেবতা করে, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেমে "গুরুজনা গঞ্জনা" দেয়, প্রতিবাসী প্রতিবাদী হয়, লোকে ছি ছি করে, ইহা সেই প্রেম। যাহাতে কলঙ্ক আছে, লুকাচুরি আছে, অনুতাপ আছে, অধর্ম্ম আছে, ইহা সেই প্রেম। ইন্দ্রিয়লালসাতেই যাহার উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই যাহার পরিসমাপ্তি, ইহা সেই প্রেম—কেবল রক্তমাংসের প্রেম।

কাজেই প্রেম অতি সামান্য। ইহার দায়ে নায়িকা কখন আত্মবিস্মৃত হয়েন না। যখন বড় দুঃখে কাতর, তখনও আপন ক্ষতিলাভ গণনায় রত, ক্ষতিলাভ গণনায় অভ্রান্ত। যখন প্রণয়-পাত্র প্রবাসে যাইতেছেন, তখনও লোকের কথার ভয়ে তাঁহাকে মর্ম্মকথা বলা হইতেছে না—

"যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।"

ভোগলালসা-কলুষিত বলিয়া এ প্রণয় বড় স্বার্থপর। আপন সুখসম্ভোগের জন্য প্রণয়পাত্রের প্রাণে কষ্ট দিতেও কুণ্ঠিত নহে। তাঁহার মনোবেদনাতেই যদি বাসনাসিদ্ধির উপায় হয়, তবে তাহাতেও রাজি। নায়িকা বিরহ-সন্তপ্তা হইয়া বিচ্ছেদকে উদ্দেশ করিয়া গাইতেছে—

"যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একবার।
যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ,
হান গে তায় বিচ্ছেদ বাণ;

যদি জ্বালায় জ্বলে আমায় ব'লে মনে পড়ে তার।"

আবার,—

"বিচ্ছেদ ব্যথার ব্যথা কিছু তায় দিও বিশেষে।
নারীর প্রাণে কত ব্যথা জানে যেন সে।"

ইহা প্রকৃত ভালবাসার ভাষা নহে। যথার্থ প্রেমানুরাগ যাহার মনে আছে, সে প্রাণান্তেও এমন কামনা করিতে পারে না। প্রকৃত প্রেম, প্রণয়পাত্রের অতি সামান্য ক্লেশ নিবারণের জন্যও আপনার বুক চিরিয়া বুকের রক্ত দিতে অগ্রসর হইবে; বাঞ্ছিতকে সুখী করিবার জন্য আপন হাতে আপনার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া দিতে প্রস্তুত থাকিবে; তাহা কখন আপনার কষ্ট নিবারণেব জন্য প্রীতিপাত্রের মনে 'বিশেষ ব্যথা' দিতে চাহিবে না। এই বিরহিণী প্রকৃত প্রেমশালিনী হইলে গাইতেন —

আমার মনোবেদনা কভু শুনা'ওনা তায়।
শুনিলে আমার দুঃখ, সে পাছে বেদনা পায়।
না বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল,
শুনিয়া তার মঙ্গল তবু ত প্রাণ জুড়ায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রকার. উচ্চ প্রেমের ভাব রাম বসুর বিরহ সংগীতে নাই। যাহা বলিয়াছি তাই —আধ্যাত্মিকতার অভাবই এই সকল প্রেম-সংগীতের প্রধান দোষ। ইন্দ্রিয় লালসার আধিক্যই ইহাদের প্রধান কলঙ্ক।

কিন্তু একটি কথা আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও রুচি অনেকটা সমসাময়িক সামাজিক অবস্থানুসারে গঠিত হয়। কার্লাইল এক স্থলে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যকলাপের জন্য সেই ব্যক্তি যতটা দায়ী, সমাজ তদপেক্ষা অধিকতর দায়ী। ইহা সত্য। এ জগতে কেহ একা নহে, কেহই অন্যনিরপেক্ষ নহে। পরস্পরনির্ভর, পরস্পরাবলম্বন মনুষ্যের জীবন। এ পৃথিবীতে আসিতে হয় পরের উপর নির্ভর করিয়া, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হয় পরের হাত ধরিয়া, থাকিতে হয় পরকে অবলম্বন করিয়া।

আমাদের দৈনন্দিন অভাবের নিরাকৃতি পরের সাহায্যে; আমাদের উচ্চতম প্রবৃত্তি সকলের তৃপ্তি পরের সাহচর্য্যে। পর হইতে জন্ম, পর হইতে অন্ন, পর হইতে শিক্ষা, পর হইতে খ্যাতি,—পরের হাতে মান, পরের হাতে মর্য্যাদা। পরকে সঙ্গী না করিলে সুখভোগে সুখ হয় না; পরে ভাগ না লইলে দুঃখভার লঘু হয় না—পরের মুখের হাসিতে অন্তরাত্মা আনন্দে উৎফুল্ল, পরের চোখের জলে হৃদয় বিষাদে অবসন্ন। পরের সঙ্গে যখন এতটা ঘনিষ্ঠতা, পরের উপর যখন এতটা নির্ভর, তখন পরের প্রভাব কেমন করিয়া এড়াইতে পারা যায়? তাহা হইবার নহে। এ মরভুবনে, এ জীবনধারণে, তাহা অনতিক্রম্য। জন্মাবধি যে ছায়াতলে বিশ্রাম করিয়া শক্তিসংগ্রহ করিয়াছি, যে বাতাতপে জীবনী লাভ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার প্রভাব অস্থিমজ্জাশোণিতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—জীবনের অংশীভূত হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, মনুষ্যের রুচি, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি অনেকটা তৎকালবর্ত্তমান সামাজিক সংস্থানের প্রতিকৃতি মাত্র। কালের অনভিভবনীয় মাহাত্ম্য প্রতিভার দুর্দম স্বানুবর্ত্তিতাকে পর্য্যন্ত আপন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লয়—মনুষ্য কালের ক্রীড়নক, কালের ছায়া। এক্ষণে, আমরা যদি এই তত্ত্বের আলোকে সমালোচ্য সংগীতনিচয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে রচয়িতাকে বোধ হয় আরোপিত কলঙ্কভার হইতে অনেকটা মুক্তি দেওয়া যায়।

কারণ সকল নির্দ্দেশ করিবার এ স্থান নহে, কিন্তু আমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে ভোগ বিলাসের ভাব যে অত্যন্ত প্রবল, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবে না। বকল্ সাহেবের গ্রন্থের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের জন্য কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজনও বোধ হয় নাই। বিলাসের ভাব এতই প্রবল, যে উহা সর্ব্বত্রই প্রবেশ করিয়াছিল, সকল বিষয়কেই স্পর্শ করিয়াছিল। পূজ্যপাদ বৃদ্ধ ঋষি ভক্তিরসে ভোর হইয়া গঙ্গার স্তব করিলেন, তাহাতেও একটু চন্দনের ছিটা না দিয়া থাকিতে পারি-

লেন না।—তাহার মধ্যেও 'বসুধা শৃঙ্গার হারাবলী।' তার পর এই বহুবিবাহ-প্রচলিত দেশে, যৌনসাহচর্য্য বিষয়ে দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠার ভাব কাজেই অত্যন্ত দুর্ব্বল। আজ কাল যে আমরা প্রেমের পবিত্রতা ও একনিষ্ঠতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছি, সে প্লেটো এবং কোম্‌তের প্রসাদাৎ। তাহাতে আমাদের জাতীয় গৌরব কিছু নাই। ইহার উপর বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরকীয়া নায়িকাকে প্রাধান্য দিয়া সোণায় সোহাগা সংযোগ করিল। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ ;—বাঙ্গালি আপন আপন অভিধানে লিখিল, যে আপন স্ত্রীকে ভাল বাসিবে সে স্ত্রৈণ, যে পরের স্ত্রীকে ভাল বাসিবে সেই প্রেমিক। ইহার উপর মুসলমান আপন দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর ধরিয়া ষোল কলা সম্পূর্ণ করিলেন। সেই সময়ে এই সকল সংগীত রচিত হইল। রাম বসু যে সময়ের লোক, তখন বঙ্গদেশে মুসলমানের একাধিপত্য। এবং বাঙ্গালি অন্ধ অনুবর্ত্তিতায় তুলনা-রহিত। বাল্যকালে কাহিনীতে শুনিয়াছিলাম —রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সিদ্ধির ঝুলি তুমি কার?' ঝুলি বলিল 'যখন যার কাছে থাকি, তখন তার।' বাঙ্গালির প্রকৃতি এই ঝুলির মত—যখন যার কাছে থাকে, তখন তার। বহুরূপীর ন্যায়, যখন যে সাহচর্য্যে থাকে, তখন সেই বর্ণ ধারণ করে। এই কারণে, সে সময়ের বঙ্গসমাজের রুচি মুসলমানের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। এখনকার বাঙ্গালি যেমন ইংরেজের কাছে কোট্ পেণ্টুলন পরিতে, চপ্ কট্‌লেট খাইতে শিখিয়াছে, তখন তেমনি মুসলমানের কাছে ইজার চাপ্‌কান পরিতে, কোর্মা কাবাব্ খাইতে শিখিয়াছিল। আজ যেমন ইংরেজের দেখা দেখি এই সাত শত বৎসরের দাসজাতি রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতেছে, তখন তেমনি মুসলমানের দেখা দেখি 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া বিধর্ম্মী অত্যাচারীর পদতলে তটস্থ হইয়া মস্তক নত করিয়াছে। আবার বাঙ্গালি, যখন যাহা করে, তাহাতেই কিছু বাড়াবাড়ি করে। আজ ইংরে-

জের মন্ত্রশিষ্য হইয়া যে বাঙ্গালি স্ত্রীকে দেবতা বলিয়া জানিয়াছে এবং দাম্পত্য প্রণয়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছে, তখন সেই বাঙ্গালিই মুসলমানের চেলা হইয়া শিখিয়াছিল যে, স্ত্রীলোক বিলাসের উপকরণ বা সন্তান প্রসবের যন্ত্র মাত্র—শিখিয়াছিল যে, বাবু হইতে হইলেই দুই একটা বেশ্যা রাখিতে হয়। এইরূপ সামাজিক অবস্থায় রাম বসুর আবির্ভাব। সুতরাং তাঁহার প্রেম-সংগীতের যাহা কিছু কলঙ্ক আছে, তাহার নিন্দার ভাগী একা তিনি নহেন—সে সময়ের সমাজকেও খানিকটা দিতে হইবে। এইরূপ সময়ে, এইরূপ সমাজে বর্ত্তমান থাকিয়াও রাম বসু যে সকল প্রেমসংগীত রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও যে আমরা দুই এক স্থলে উচ্চ প্রেমের আত্মবিসর্জ্জন ও আত্মবিস্মৃতির ভাব দেখিতে পাই, তজ্জন্য আমরা সহস্র মুখে তাঁহার প্রশংসা করি। ধর্ম্মনীতি ছাড়িয়া দিয়া, কেবল সাহিত্য বলিয়া বিচার করিলে, এই সকল সংগীতকে অতি সুন্দর বলিতে হয়। এমন সুন্দর রচনা কৌশল, এমন পরিপাটী কথা ও ভাবের গাঁথনি, প্রতারিত অনুরাগের সাভিমান অনুযোগ প্রকাশের এমন সুন্দর ভঙ্গী বাঙ্গালা সংগীতে বিরল। রাম বসুর নায়িকাদিগের আর যত দোষ থাক্, তাঁহারা সুরসিকা বটেন।

এক্ষণে আমরা রাম বসুর দুই চারিটা গান পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব ;—

মহড়া।

যৌবন জনমের মত যায়।
সে তো আসা পথ নাহি চায়॥
কি দিয়া গো প্রাণ সখি, রাখিব উহায়॥
জীবন যৌবন গেলে আর ;
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার ;
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়॥

চিতেন।

গেল গেল এ বসন্ত কাল, আসিবে তৎকাল;
কালে হলো কাল এ যৌবন কাল,
কাল পূর্ণ হলে রবে না,
প্রবোধে প্রবোধ মানে না।
আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায়॥

অন্তরা।

হায় যোল কলা পূর্ণ হলো যৌবনে আমার,
দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে বিফলেতে যায়।

অন্তরা।

কৃষ্ণ পক্ষ প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়।
শুক্ল পক্ষ হয়, পুনঃ পূর্ণোদয়।
যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়,
কোটি কল্পে পুনঃ নাহি হয়;
যে যাবে সে যাবে হবে অগস্ত্য গমন প্রায়।

মহড়া।

প্রাণ বলো না প্রাণ।
ছি ছি হাস্‌বে লোকে; আমার পাকে,
হবে শেষে অপমান।
যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই প্রাণ,
আমায় করে অন্তরের অন্তর, যারে অন্তরে দিয়েছ স্থান।

চিতেন।

নূতন যারা, তোমার তারা নয়নের তারা।
যে জন স্থলে ভুল, দুটি আঁখির শূল,

কেন তায় আদর করা ?
ত্যজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান, কর পূজ্যধনের অপমান

অন্তরা।

কথায় তব নব ভাব, যারে প্রাণ বল, তার সুখ ;
আমায় কেন, বলে প্রাণ, বাড়াও দ্বিগুণ দুঃখ ?

চিতেন।

ভেবেছিলাম প্রাণের প্রাণ, গিয়াছে সেদিন।
এখন হলেম প্রাণ, তোমার কথার প্রাণ,
কিন্তু কর্ম্মে ফল হীন।
চোখের দেখা, মুখের আলাপন,
হলো সেই লক্ষ লাভ জ্ঞান।

মহড়া।

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি,
বলা হলো না।
শরমে মরম কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে.
নারী জনম যেন করে না।

চিতেন।

একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে ;

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না।

অন্তরা।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম স্বজনি ;
অনা(য়া)সে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।
একি সখি হলো বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান,
মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ ;
যদি সে হলো নিদয়, লইল বিদায়,
তবে যেন সখি প্রাণও রহেনা।

মহড়া।

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভাল বাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বোলে ধরে রাখব না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল।
সদা রাগে কর ভর, আমিত ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।

চিতেন।

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ হলো এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোল ও বিধুবদন।
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন ত প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাব না।

(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ।
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
কি প্রেমের বশে, প্রেম রসে তুষতে প্রাণ,—
রাখিতে হে অধিনীর সম্মান।
অভিমানী হতেম হে তোমায়,
প্রাণনাথ কার সোহাগে, অনুরাগে,
ধরতে আমার পায়।
তুমি আমি যে সেই আছি,
তবে কিসে গেল সে সম্মান।

চিতেন।

আবাহন করে প্রেম দিলে বিসর্জ্জন।
সে যেমন হোক্, হয়েছে,
আমার কপালে ছিল হে যেমন।
রঙ্গ রসে ছিলাম এত দিন,
প্রাণ নাথ, প্রেমের পথে, দুজনাতে কে কার অধীন।
শেষে যদি কর্‌বে এমন, কেন আগে বাড়াইলে মান।

অন্তরা।

ওরে প্রাণ, কথা কবার নয়, কইতে ফাটে হিয়া।
পূজ্য ছিলাম, ত্যজ্য হলাম যৌবন গিয়া।

চিতেন।

দৈব দেখা প্রাণনাথ হতো হে পথে;
আপনা আপনি ভুলিতে, হাতে আকাশের চন্দ্র পেতে।
এখন ত সেই পথের দেখা হয়;
প্রাণনাথ লজ্জাতে মুখ ঢাক যেন ঠেকেছ কি দায়।
প্রেম গেছে, যৌবন গেছে, শেষে তুমি করিলে প্রস্থান।

আরও দুই চারিটা গান উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই রাম বসুর যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে।

সতীদাহ।

এক মরণে দুই জন মরিত, ইহা আমাদের পক্ষে প্রায় কাহিনী হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন, যে অতি অল্পকাল পূর্ব্বে এরূপ মৃত্যু সচরাচর সংঘটিত হইত। ইংরেজের অধিকৃত প্রদেশসমূহ হইতে প্রথাটা রহিত হইয়া গিয়াছে বটে,—মুসলমান রাজত্বকালেও অনেক স্থানে সহগমন নিষিদ্ধ ছিল; আবে দুবোয়া দাক্ষিণাত্যের রীতিনীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মুসলমান শাসনকর্ত্তারা আপন আপন শাসনাধীন প্রদেশে সতী যাইতে দিতেন না, এবং আর্য্যাবর্ত্তে এ ব্যবহারের বহুলপ্রচার হইলেও দাক্ষিণাত্যে বিরলপ্রচার ছিল;—ইংরেজের অধিকারমধ্যে রহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজ্য সকল হইতে এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। সে দিনও মৃত জং বাহাদুরের ভার্য্যারা সহগমন করিয়াছেন।

প্রথাটা কত কালের, তাহা স্থির করা দুষ্কর। অনেকের মতে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সতীগমনের অনুমতি আছে; কিন্তু উইল্‌সন, মক্ষমূলর, কাউয়েল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উক্ত বিধির পাঠের সত্যতায় সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন, যেখানে 'অগ্নে' আছে, সেখানে 'অগ্রে' পড়িতে হইবে। সে যাহাই হউক, অনুগমনের অনুকূল বিধি বেদে থাকুক বা নাই থাকুক, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে যে আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অঙ্গিরা, ব্যাস, পরাশর, পত্যনুগমনই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদিগেরই যখন কালনির্ণয় হয় না, তখন ইঁহাদের বচনের উপর নির্ভর করিয়া প্রথাবিশেষের মূলানুসন্ধান কিরূপে হইতে পারে? তবে, ভিন্নদেশীয় সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ আছে। দিওদোরস্ এই প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ইউমিনিসের সৈন্যমধ্যে সতীদাহ হইয়াছিল।

অতএব ইহা একরূপ সিদ্ধ, যে সতীদাহ প্রথাটি সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ বা ততোধিক কালের।

প্রথাটির মূল নির্ণয় করা আরও কঠিন। এ সম্বন্ধে লিখিত কিছু নাই, সুতরাং ইহার উপর অনুমান ব্যতীত আর কিছু চলিতে পারে না। তন্মধ্যে দুই চারিটার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

দিওদোরস্ বলেন, পত্যনুগমনের মূল কারণ, হিন্দুসমাজে বিধবার দুর্গতি এবং দুরবস্থা। এ অনুমানটি সঙ্গত বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। সামাজিক নিয়মানুসারে বিধবার যে দুর্গতি, তাহা বিধবামাত্রেরই—দুই চারি জনের নহে। বৈধব্য-দুঃখই যদি সহমরণের কারণ হইত তাহা হইলে অধিকাংশ অথবা বহুসংখ্যক বিধবা পতিবর্ত্মগা হইত। তাহা হয় নাই। সতী যাওয়া যখন অত্যন্ত প্রচলিত, তখনও অনুগামিনী বিধবার সংখ্যা শতকরা এক জনেরও ন্যূন—উর্দ্ধসংখ্যা, হাজারে পাঁচ জন। এতও বটে কি না, সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, বৈধব্যনিবন্ধন যে দুঃখ, তাহা নীচজাতীয়ার অপেক্ষা উচ্চজাতীয়ার অধিক—প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য কেবল ব্রাহ্মণের বিধবার কপালে। সুতরাং ভারতবর্ষের যে সকল স্থলে সতীদাহ হইত, সে সকল স্থানেই নীচজাতীয় সতীসংখ্যা অপেক্ষা উচ্চজাতীয় সতীসংখ্যা অবশ্য অধিক হওয়া উচিত ছিল, কেন না উচ্চজাতীয় বিধবার দুর্গতি অধিক। কিন্তু তাহা হয় নাই। সর্ তামস্ ষ্ট্রেঞ্জ বলেন, আর্য্যাবর্ত্তে না হউক, অন্ততঃ দক্ষিণাপথে সতীর সংখ্যা নীচ জাতির মধ্যেই অধিক। দিওদোরসের অনুমানের সঙ্গে এ কথার সামঞ্জস্য হয় না। অতএব ইহা একরূপ নিশ্চত যে বৈধব্যদুঃখ সহমরণের একমাত্র কারণ ত নহেই, প্রধান কারণও নহে।

তবে কি স্বর্গলাভের জন্য? তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; কেননা চিতারোহণ অপেক্ষা এমন অনেক সহজ কার্য্য আছে, যাহা করিলে শাস্ত্রানুসারে স্বর্গ হয়। কিন্তু স্বর্গের জন্য সে সকল অপেক্ষাকৃত সহজ কাজও লোকে করে না যদি স্বর্গের জন্য

সুকরতর কার্য্য না করে, তবে সেই স্বর্গের জন্যই যে এমন দুষ্কর কার্য্য করিবে—জলন্ত বহ্নিতে জীবন্তে পুড়িয়া মরিবে—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ইহাও বুঝা গেল যে কেবল স্বর্গের জন্য সতীরা পুড়িত না।

বুঝি ভালবাসার জন্য। তাহাও বোধ হয় না। স্বামীকে ভালবাসে বলিয়া, স্বামি-বিরহ-দুঃখ অসহ্য বলিয়া যে প্রাণত্যাগ করিতে চায়, তাহার চিতারোহণ করিয়া পুড়িয়া মরিবার আবশ্যকতা রাখে না—সে অন্য উপায়েও মরিতে পারে। সত্য সত্যই মরিবার ইচ্ছা থাকিলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। যমালয়ের পথ অসংখ্য। রাজবিধি একটা প্রকাশ্য পথ রুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু সকল পথ বন্ধ করা রাজবিধির সাধ্যাতীত। প্রকাশ্য রূপে, ধূমধাম করিয়া, ধূপধূনা জ্বালিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া চিতারোহণ করা যেন রহিত হইল, কিন্তু তেমন ইচ্ছা থাকিলে, অন্য পথও আছে—গলায় দড়ি দেওয়া যাইতে পারে, বিষ খাওয়া যাইতে পারে, জলে ঝাঁপ দেওয়া যাইতে পারে—ধ্বংস-পুরের সত সহস্র দ্বার। তবে, যে দিন হইতে ১৮২৯ শালের ১৭ আইন জারি হইয়াছে, সেই দিন হইতে আর কেহ পতি-বিরহে প্রাণত্যাগ করে না কেন? আরও একটা কথা আছে। যে কেহ হিন্দুসমাজের প্রকৃতি এবং গতি একটু পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে স্বামীকে ভাল বাসিতে হইবে, ইহা কোন কালেই হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক নারী-ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। হিন্দুললনার ধর্ম্ম, পতিভক্তি - পতিপ্রেম নহে। হিন্দুসমাজ হিন্দুললনাকে ইহাই শিখায় যে, স্বামী দেবতা, তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে, তাঁহার প্রসাদ খাইতে হইবে, তাঁহার পাদোদক সেবন করিতে হইবে,—তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইবে, এ শিক্ষা হিন্দুসমাজের নহে। এই অপরিবর্ত্তনীয় জাতিভেদপ্রপীড়িত বৈষম্যপূর্ণ দেশে সাম্য-নীতি নাই, সুতরাং প্রেম-শিক্ষাও নাই। অতএব, কেবল ভালবাসার জন্যও সতীরা পুড়িত না।

তবে কেন? কারণাভাবে কার্য্য হয় না। আমরা দেখিলাম, যে পূর্ব্বলিখিত কারণনিচয়ের মধ্যে বিশেষ কোনটিই প্রকৃত কারণ নহে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, সতীদাহের নিন্দাপ্রশংসায় সকলগুলিরই দাবি আছে। প্রথমতঃ, এই চিতায় পুড়িতে পারিলে স্বর্গ নিশ্চিত। কিন্তু স্বর্গ হইলেই যথেষ্ট হইল না;

যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির আশা

সুখ দুঃখ মনের খনিতে।

অতএব বাঞ্ছিতকে চাই, নতুবা বিমল খাঁটি সুখ হইল না। সতী যাইলে সে সুখও পাওয়া যাইবে। স্বামীর যদি পাপ থাকে—এ সংসারে কাহার নাই? তাহাও এই আত্মবিসর্জ্জনে ধুইয়া যাইবে। হিন্দুললনার এ সংসারে সুখ স্বামী লইয়া। স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারিলে স্বর্গের সুখ, সংসারের সুখ, উভয় সুখই পাওয়া গেল। অতএব দ্বিতীয়তঃ, স্বামি-লাভ। তৃতীয়তঃ, দুঃখনিবৃত্তি; বৈধব্য এবং দুঃখ আমাদের দেশে একই কথা। চতুর্থতঃ, গৌরবলাভ; যে সাধ্বী পত্যনুগমন করিল, সে ইহলোকেও ধন্য পরলোকেও ধন্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা যে মত প্রকাশ করিলাম, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ সাহেবেরও সেই মত।

এই স্থলে সহমরণ প্রথার দোষ গুণ বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। এতদুদ্দেশে আমরা প্রথমে সতীদাহের প্রতিকূল তর্ক সকলের সমালোচনা করিব। তৎপরে অনুকূল তর্কের অবতারণা করা যাইবে।

সহমরণের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, আত্মহত্যা মহাপাপ এবং যাহারা আত্মহত্যার সহায়তা বা অনুমোদন করে, তাহারও মহাপাতকী। যতদূর সাধ্য, এ পাপপ্রবাহ রোধ করা উচিত।

আত্মহত্যা পাপ কিসে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ফল-নিরপেক্ষ পাপপুণ্যে আমাদের বিশ্বাস নাই। যাহা পাপ, তাহা সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল অবস্থাতেই পাপ, যাহা পুণ্য, তাহাও

তেমনি সকল অবস্থায় পুণ্য; এ মতে আমাদের আস্থা নাই। আমাদের বিশ্বাস, যাহা স্থানবিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে দুষ্কর্ম্ম, স্থানান্তরে এবং অবস্থান্তরে তাহা সৎকর্ম্ম হইতে পারে। সুতরাং বিষয় বিশেষকে সাধু বা অসাধু বলিতে হইলে তাহার সুফল কুফল দেখান চাই। নতুবা কেবল সাধু বা অসাধু বলিলে বিচার্য্য কথাটা স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল। ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক। অতএব দেখা যাউক, সহগমনে সমাজের কোন অমঙ্গল আছে কি না।

দুই চারি দশ জন মনুষ্যের মৃত্যুতে যে সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট আছে, ইহা আমরা বোধ করি না। পুরুষের মৃত্যু, সমাজকর্ত্তৃক অনুভূত না হইলেও, তাহাতে পরিবারবিশেষের গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ সংঘটিত হইতে পারে। এ দেশীয় স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে সে অসুবিধা টুকুও নাই। কেবল সাংসারিক অসুবিধার কথা বলিতেছি, মানসিক সুখ দুঃখের কথা পরে বলিব।

যাঁহারা পৃথিবীর প্রভূত উপকার করিয়াছেন, মহান্ সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, চিন্তার জন্য নূতন পথ খোদিত করিয়াছেন, মনুষ্যজাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন, তাঁহাদের অপগমেও সংসারের তাদৃশ ক্ষতি নাই। নিউটন না থাকিলেই যে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কৃত হইত না, এমন নহে। সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ সত্য গালিলীয় না জন্মেলেই যে চিরকাল অজ্ঞাত থাকিত, এরূপ নহে। হর্বি না জন্মিলেও রক্তসঞ্চরণ আবিষ্কৃত হইত, টরিচেলি বাল্যে মৃত্যুকবলিত হইলেও বায়ুর ভার স্থিরীকৃত হইত; তবে কি না, দশ দিন পূর্ব্বে হইল, না হয় দশ দিন পরে হইত। নিউটন অথবা কেপ্লর, গালিলীয় অথবা বেকন, বিস্তৃত ক্ষেত্রপার্শ্বস্থ উচ্চশির গিরিশৃঙ্গ মাত্র;—সূর্য্যালোক ক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে অবশ্য তাঁহাদের মস্তকে পড়িবে, কিন্তু তাঁহারা না থাকিলেও সূর্য্যালোক ক্ষেত্রে আসিত।

সকলই সময়ে করে। নিউটনের পূর্ব্বে কি ইউরোপে বুদ্ধি-

মান্ লোক ছিল না—তত্ত্বানুসন্ধায়ী লোক ছিল না, তবে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই কেন? ইহার এক মাত্র সদুত্তর, তখন সময় হয় নাই। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে যে সকল সত্যের আবিষ্কার এবং প্রচার নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সে সকল আবিষ্কৃত এবং প্রচারিত হয় নাই। যে সময়ে এবং সমাজের যে অবস্থায় তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে, সে অবস্থায় তদাবিষ্কৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতই হইত।* নিউটন না করিতেন, আর কেহ করিত; কেবল—বলিয়াছি ত, দশ দিন অগ্র পশ্চাৎ। তাহাতেই বলি, কাহারও সমাগমাপগমে সংসারের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যে ক্ষতি, তাহা অপূরণীয় নহে। যে বৃদ্ধি, তাহা অবশ্যম্ভাবী।

নিউটন অথবা কেপ্লরের, কোমৎ অথবা বিষার অভাবে যদি জগতের বিশেষ এবং অপূরণীয় ক্ষতি না থাকে, তবে মুগ্ধা, প্রণয়-বিহ্বলা, বিরহকাতরা, সন্তাপদগ্ধা, অন্তঃপুরবদ্ধা হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে কি ক্ষতি? বিদ্যায় যে বর্ণজ্ঞানশূন্যা, ভূয়োদর্শন যার স্বামিমুখ পর্য্যন্ত, সংসারজ্ঞান যার শয়নমন্দিরের চতুঃসীমাবদ্ধ, ঘর হইতে আঙ্গিনা যার বিদেশ—হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের কি ক্ষতি?

এরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, হিন্দুর স্ত্রীলোক মাত্রেরই ত এই দুর্দ্দশা—সকলেই নিরক্ষর, অজ্ঞান, অন্তঃপুরবদ্ধ—তবে, সধবা, বিধবা, অধবা সকলেই মরিবে কি?

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুবিধবার যে অবস্থা, সেই অবস্থা যাহারই হইবে তাহাকেই মরিতে হইবে, এমন কথা আমরা বলি নাই। আমরা এই মাত্র বলিয়াছি যে, তাহার মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতি নাই। দ্বিতীয়তঃ কুমারী এবং সধবা যে সমাজের কোন উপকারে লাগে না, তাহা কে বলিল? সমাজের

* নিউটন যে সময়ে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করেন, ফ্রান্সে অন্য এক ব্যক্তি সেই সময়ে উক্ত নিয়ম আবিষ্কার করিযাছিলেন।

অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহাদের উপর নির্ভর করে। তাহারা মরিলে গর্ভ ধারণ করিবে কে? নূতন জীবের সমাবেশ না হইলে, যেমন যেমন প্রাচীনেরা ইহলোক ত্যাগ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে সমাজও লুপ্ত হইবে। কিন্তু এ কার্য্যকারিতা বিধবার নাই। বিধবার বিবাহই যখন নিষিদ্ধ, তখন গর্ভধারণের ত কথাই নাই। যদি কোন হত-ভাগিনী অবৈধ উপায়ে গর্ভধারণ করে, সেও গর্ভ বিনষ্ট করিতে বাধ্য হয়, নতুবা তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়।

আরও একটা তর্ক আছে। ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মনুষ্যও, জীবিতচেষ্টানিবন্ধন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে, উপস্থিত উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও উন্নত হইতে হইলে, এই কঠোর জীবিতচেষ্টা দ্বারাই হইতে হইবে। জীবিতচেষ্টা যত কঠোর হইবে, উন্নতিও তত অধিক হইবে। আবার জীবিত চেষ্টার মূলভিত্তি, জনসংখ্যার আধিক্য এবং বৃদ্ধি। যে কোন প্রথা জীবসংখ্যা হ্রাস করে, সুতরাং জীবন-সংগ্রামের বেগ হ্রস্ব করিয়া দিয়া উন্নতির ব্যাঘাত জন্মায়, তাহাকেই অবশ্যই দোষাবহ বলিতে হইবে। অতএব সহমরণ প্রথা মন্দ।

ইউরোপে এবং আমেরিকায় এ তর্কের উত্তর নাই। ভারত-বর্ষে আছে। স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবিতচেষ্টা অতি অল্প। যাহা কিছু আছে আমেরিকায়। ইউরোপে তদপেক্ষা অল্প। ভারত-বর্ষে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কেন না, নিতান্ত ইতরজাতি ব্যতীত ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্ব স্ব অভাব পূরণের ভার লইতে হয় না। পিতা বা ভ্রাতা, তৎপরে স্বামী, তৎপরে পুত্র, এ সকলের অভাবে আত্মীয়,—ইহাঁরাই তাহাদের অভাবপূরণের ভার লইয়া থাকেন। যাহাকে নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে হয় না, তাহার আবার জীবিতচেষ্টা কি?

স্ত্রীলোকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবিতচেষ্টা না করিলেও পরম্পরা সম্বন্ধে যে জীবিত চেষ্টার সাহায্য করে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য—

তাহারা গর্ভধারণ করে বলিয়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এদেশীয় বিধবায় গর্ভধারণ করে না, কেন না বিধবাবিবাহই নিষিদ্ধ। সুতরাং এদেশীয় বিধবা জীবিতচেষ্টার সাহায্যও করে না। অতএব উপরি-উক্ত তর্ক ভারতবর্ষে খাটিল না।

সতীদাহের বিরুদ্ধে আর একটা আপত্তি এই যে, সতীদিগের ইচ্ছা না থাকিলেও আত্মীয় স্বজন অনেক সময়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিত। সহজে সিদ্ধকাম না হইলে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ভয়প্রদর্শন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার, ছল, বল, কৌশল,—এ সকলও অবলম্বিত হইত। সে অবস্থায় এ সকলের দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধিও হইত। একেই স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কারান্ধা এবং সংসারজ্ঞানশূন্যা, তাহাতে আবার তখন নববিয়োগবিধুরা, সুতরাং বীতসংসারানুরাগিণী; এ অবস্থায় কৌশলে প্রতারিত করা অতি সহজ।

কদাচিৎ কোথাও এরূপ ঘটিলেও ঘটিয়া থাকিতে পারে। হইতে পারে, কোন স্থলে কোন অর্থলোলুপ আত্মীয় বিষয়াধিকারিণী বিধবাকে পোড়াইয়া মারিবার যত্ন করিয়াছে। হইতে পারে, কোথাও কোন অনুদারপ্রকৃতি আত্মীয় ভবিষ্যৎ কলঙ্কের আশঙ্কা করিয়া নববিরহিণীকে জ্বলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের দোষ প্রথার উপর দেওয়া উচিত নহে। আমি যদি কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কোন সদনুষ্ঠানকে আমার স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করি, সে পাপে আমার—প্রথার দোষ কি? ধর্ম্মভাবের দোহাই দিয়া অনুষ্ঠিত না হইয়াছে, জগতে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি ধর্ম্মভাবকে মন্দ বলিতে হইবে? পশুপ্রকৃতি গোস্বামীদিগের চরিত্র দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিচার হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ক্লাইব এবং হেষ্টিংসের চরিত্রের জন্য খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মকে দায়ী করা বিহিত নহে। ইহা মনুষ্যচরিত্রের দোষ, এই রক্তমাংসের দোষ; এ দোষ ব্যক্তি বিশেষের, এ দোষ স্বভাবের—সহমরণ প্রথা তাহার দায়ী নহে।

যাঁহারা মনে করেন, যে অধিকাংশ স্থলেই বলপ্রয়োগ অথবা

প্রতারণার দ্বারা অবলাগণ চিতানলে নিক্ষিপ্ত হইত, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত। ইংরেজ এরূপ মনে করিতে পারেন,—চীনাবাজারের ফিরিওয়ালাদিগের চরিত্র দেখিয়া লর্ড মেকলে সমস্ত বাঙ্গালির মস্তকে গালি বর্ষণ করিয়াছেন—কিন্তু এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমরা অধিক অভিজ্ঞ। আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে অধিকাংশ স্থলেই পতিবিয়োগবিধুরা সতী আপন ইচ্ছায় পতির অনুগমন করিতেন। ইংরেজদিগের মধ্যেও যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারাও এইরূপ বিশ্বাস করেন। এলফিন্‌ষ্টোন লিখিয়াছেন,—সকল স্থলেই না হউক, অধিকাংশ স্থলেই আত্মীয়েরা অকপট হৃদয়ে মরণোদ্যতা সাধ্বীকে নিবারিত করিতে চেষ্টা করিতেন। আপনারা অনুরোধ করিতেন পুত্র কন্যায় অনুরোধ করিত, বন্ধুবান্ধব এবং পদস্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনুরোধ করাইতেন, উচ্চ পরিবার হইলে স্বয়ং রাজা আসিয়া অনুরোধ করিতেন। হেন্‌রি জেফ্রিস্‌ বুস্বি সাহেব, তাঁহার 'সতীদাহ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে প্রায়ই বিধবারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশ করিয়া থাকে,—কচিৎ ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। 'সতীদাহের' এই স্থলটি এত সুন্দর, যে আমরা লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া কতকটা উদ্ধৃত করিলাম।*

---

* With rare exceptions, the suttee is a voluntary victim. Resolute, undismayed, confident in her own inspiration, but betraying by the tone of her prophecies, which are almost always auspicious, that her tender woman's heart is the true source whence that inspiration flows. Her veil is put off, her hair unbound; and so adorned, and so exposed, she goes forth to gaze on the world for the first time, face to face, as she leaves it. She does not blush or quail. She scarcely regards the busied crowd who press so eagerly towards her. Her lips move in momentary prayer. Paradise is in her view. She

সতীদাহের প্রতিকূল কথার আমরা আলোনা করিলাম। এক্ষণে তদনুকূল কথার বিচার করা যাউক।

হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হয়। সে নিজে দুঃখিনী এবং তাহার দুঃখ দেখিয়া আত্মীয় স্বজন দুঃখী। যার গৃহে বিধবা কন্যা, তাহার দুঃখের পার নাই। নৈদাঘ একাদশীতে প্রাণের অধিক ধন আঞ্চান করিয়া বেড়ায়, তাহা স্বচক্ষে দেখিতে হয়—আপনার হাতের গ্রাস চক্ষের জলে সিক্ত করিয়া মুখে তুলিয়া দিতে হয়। পাপ সমাজের এমনই নিদারুণ রীতি, যে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিলেও একবিন্দু জল দিবার যো নাই—পিতার প্রাণ ইহাতে কাঁদে না কি? যাহাকে দশমাস দশদিন দেহাভ্যন্তরে করিয়া বহিয়াছেন, বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছেন, সেই সাগর সিঞ্চিত ধন প্রতিনিয়ত বজ্রদগ্ধ স্মৃতিতরুমূলে নয়নবারি সিঞ্চন করিতেছে, বুকে করিয়া রাবণের চিতা বহিতেছে, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত হইতেছে—মায়ের বুক ইহা দেখিয়া ফাটে না কি? তার উপর আশঙ্কা,—কোন্ দিন এই হতভাগিনী প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইবে, মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে অসমর্থ হইবে, আর অমনি আত্মীয়স্বজনের মাথা হেঁট হইবে। এরূপ আশঙ্কা যে হয় না, তাহা কে সাহস করিয়া বলিবে? পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পিণ্ডান্তপিণ্ডশেষ প্রদত্ত হইতে না হইতে গ্রামে গ্রামে মেয়ের অনুসন্ধানে ঘটক বাহির হয়—ভয়, পাছে

---

sees her husband awaiting with approbation the sacrifice which shall restore her to him, dowered with the expiation of their sins, and ennobled with a martyr's crown. Exultingly she mounts that last earthly couch which she shall share with her lord. His head she places fondly on her lap. The priests set up their chaunt; it is a strange hymeneal, and her first-born son, walking tcrice round the pile, lights the flame.

H. J. Bushby's Widow-burning. London 1855.

ছেলেটির দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে যে এ আশঙ্কা হয় না, ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? স্ত্রীলোক কি মনুষ্য নহে? তাহাদের রক্তমাংস কি অন্য উপকরণে নির্ম্মিত? অবশ্য আশঙ্কা হয়, এবং আশঙ্কা দুঃখের ভাব। বিধবার মরাই ভাল। কেবল অন্যের দুঃখ নিবারিত হয় বলিয়া বলিতেছি না, কিন্তু বিধবার মরাই ভাল। তাহার মৃত্যুতেও আত্মীয় স্বজনের দুঃখ আছে, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিলে যত দুঃখ, মরিলে কি তত? মৃত্যুনিবন্ধন যে দুঃখ, তাহা কালে মন্দীভূত হইয়া যায়; কিন্তু বিধবার দুঃখ নিত্য নূতন, সুতরাং যাহারা তাহার দুঃখে দুঃখী, তাহাদের দুঃখও নিত্য নূতন।

আবার তাহার নিজের দুঃখ। হিন্দু বিধবার জীবন দুঃখের জীবন। আহারে বল, ব্যবহারে বল, ধর্ম্মানুষ্ঠানে বল, হিন্দুবিধবার জীবন দুঃখের জীবন। আবার, সুন্দর যায়, সৌন্দর্য্যোন্মাদ ত যায় না; প্রণয়পাত্র চক্ষের বাহির হয়, প্রণয়তৃষ্ণা ত হৃদয়ের বাহির হয় না; সুতরাং হৃদয়ের জ্বালা চিরদিন হৃদয়ের ভিতর ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে। আবার দুঃখের উপর দুঃখ, স্ত্রীলোকের জন্য লজ্জার শাসন এতই কঠোর, যে বুক ফাটিয়া গেলেও মনের বেদনা মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই। হৃদয়ের তাপ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে হয়, মনের দুঃখ কেবল মন জানে, অন্তরের শ্বাস অন্তরে মিলায়, চক্ষের জল চক্ষে শুকায়,—আবার বলি, হিন্দুবিধবার জীবন বড় দুঃখের জীবন। এ দারুণ দুঃখ অপ্রতিকার্য্য, কেন না হিন্দুবালার বৈধব্য অনপনেয়। না মরিলে আর বিধবার যন্ত্রণা ফুরায় না। যে রোগের যে ঔষধ, সে রোগে তাহাই ব্যবস্থা। বিধবার মরাই ভাল।

দেখান গিয়াছে, বিধবার মৃত্যুতে সংসারের ক্ষতি নাই। দেখান গেল, বিধবার মৃত্যুতে দুঃখের হ্রাস আছে। যদি কেবল ইহাই হইত, তাহা হইলেও বিধবার মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিতাম না। কিন্তু আরও দেখান যাইতেছে, যে সহমরণে সমাজের লাভ আছে।

স্মাইল বলিয়াছেন এবং আমরাও বলি, দৃষ্টান্তের ন্যায় উপদেষ্টা নাই। যাঁহারা বলেন—আমি যাহা করি তাহা করিও না,

আমি যাহা বলি তাহাই কর—তাঁহারা মতিভ্রান্ত; তাঁহারা মনুষ্য চরিত্র বুঝেন না। এই পথে যাও,—এ কথায় কেহ যাইবে, কেহ যাইবে না। তুমি এই পথে যাও, আমি অন্য পথে যাইব,—এ কথায় হয় ত কেহই যাইবে না। কিন্তু আমি পথপ্রদর্শক হইতেছি, তোমরা আমার সঙ্গে আইস, ইহা বলিলে অনেকে যাইবে। তোমার সঙ্গে সমস্ত পথ না যাইতে পারে, অনেক দূর যাইবে। অন্ততঃ কিয়দ্দূরও যাইবে। দৃষ্টান্তের ন্যায় উপ-দেষ্টা নাই।

আর স্বামীর জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করা, কেমন দৃষ্টান্ত! পতিবিয়োগবিধুরা সতী, পবিত্রতার, সতীত্বের, ভালবাসার, আত্মবিসর্জ্জনের, সংসারে যাহা কিছু ভাল তাহারই বীরধ্বজা স্বর্গে উড়াইয়া, গভীর অনুরাগের, উৎকট মহত্বের, অপার সহিষ্ণুতার দুন্দুভিনিনাদে জগৎ ভরিয়া, জ্বলন্ত চিতারোহণ করিলেন,—এ জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর দেখিয়া কার হৃদয় গলিবে না?—ধর্ম্মে কার মতি হইবে না?—আত্মবিসর্জ্জনের মহত্ব কার হৃদয়ঙ্গম হইবে না? ধর্ম্মের পথে পাদস্খলন হইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন অনেক রমণী ভার ঠিক করিয়া লইয়া সেই পথে চলিবে। যাহাদের সতীত্বের গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের অনেকে সতীত্বের মাহাত্ম্য বুঝিবে,—পাপ পিশাচকে দূরে হইতে নমস্কার করিয়া পতিপদারবিন্দে মনস্থির করিবে। রমণীর, ধর্ম্মে আস্থা হইবে। পুরুষের, রমণীর প্রতি ভক্তি হইবে। সহমরণে সংসারের লাভ বই ক্ষতি নাই।

আর একটী কথা আছে। এ কথাটী আমরা তুলিতাম না; কিন্তু অনেক কৃতবিদ্য লোকের মুখেও এরূপ আপত্তি শুনিয়াছি বলিয়াই এ কথার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, যাহার প্রণয় এত গভীর, যাহার সহিষ্ণুতা এমন অপার, তিনি যদি না মরিয়া আবার অভিনব বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে জগতের আরও মঙ্গল।

ইহার উত্তরে আমরা বলি, যে আরও মঙ্গল হউক বা না হউক, তাহা দেখিবার আবশ্যক হইতেছে না, কেননা তিনি বাঁচিয়া থাকিলেই বা আর বিবাহ করিতে পাইতেন কই? বিধবার বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ।* কেবল শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি ছিল না, অশাস্ত্র অনেক প্রথা সমাজ মধ্যে প্রচলিত আছে,—কিন্তু ইহা দেশাচারবিরুদ্ধ; এবং আমরা হিন্দুসমাজের কথা বলিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন অবলা, আমাদের এই এঙ্গোবর্ণেকূলের সমাজের মতানুসারে, প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর পত্যন্তর পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যে স্থলে পুরুষের দুই বার বিবাহ হইতে পারে, সে স্থলে স্ত্রীলোকেরও হইতে পারা উচিত। আপনারা যে নিয়মের বাধ্য হইতে পারি না, সে নিয়মে অন্যকে বাধ্য করা অন্যায়। জানি, বুঝি, মানি; কিন্তু যখন আদৌ বিবাহই হইতে পারে না, তখন অনর্থক ধরিয়া রাখিবার ফল কি? দুঃখভোগের জন্য তাহাকে ধরিয়া রাখিবার তুমি কে? তবে যে সহমরণ প্রথার জন্য হিন্দুসমাজের এত দুর্নাম, শাস্ত্রকারদিগের এত অখ্যাতি, ইহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠা যায় না। স্বীকার করি, ভারতে স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের অনেক অত্যাচার ছিল এবং আছে—কোথায় নাই?—কিন্তু সতীদাহ তাহার অন্তর্গত নহে। দুগ্ধপোষ্য বালকের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্যা বালিকার পরিণয়, অবশ্য অত্যাচার। কুলীন কন্যার চিরকৌমার্য্য, অবশ্য অত্যাচার। মৃতভর্তৃকার চিরবৈধব্য অবশ্য অত্যাচার। কিন্তু সহমরণ অত্যাচার নহে। মৃত্যুতেই যার যাতনার অবসান, মৃত্যুতেই যার শান্তি, মৃত্যু তাহার পক্ষে অমঙ্গল নহে। যে স্থলে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, সে স্থলে সহগমনের স্বাধীনতা থাকা উচিত।

শাস্ত্র এমন নহে, যে বিধবামাত্রকেই বলপূর্ব্বক পোড়াইতে

---

* নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ইত্যাদি—পরাশর সংহিতার এ বচন বাগ্দত্তা কন্যার পক্ষে, মৃতভর্ত্তৃকার পক্ষে নহে।

হইবে। শাস্ত্র এমন নহে, যে বিধবামাত্রকেই স্বামীর মৃত দেহের সঙ্গে চিতারোহণ করিতে হইবে। যার ইচ্ছা হয়, সে মরুক;— ইহাতে অত্যাচার কি?

তবে শাস্ত্রকারদিগের কলঙ্ক এই যে, বিধিটা একতরফা করিয়াছিলেন। পরাশর যেমন লিখিয়াছিলেন, যে সহমৃতা বিধবা সাড়ে তিন কোটী বৎসর স্বর্গভোগ করিবে, * তেমনই সঙ্গে সঙ্গে যদি লিখিতেন, যে সহমৃত পুরুষ সাড়ে তিন শত কোটী বৎসর স্বর্গভোগ করিবে, তাহা হইলে এত কলঙ্কের ভাগী হইতে হইত না।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ উঠাইয়া দিয়া ভাল করিয়াছেন কি? বেণ্টিঙ্ক সাহেবকে আমরা এ সদনুষ্ঠানের জন্য আশীর্ব্বাদ করিব, না অভিসম্পাৎ করিব? চস্‌মা চোখে সমাজসংস্কারক বাবুর মনে কি আছে, তা তিনিই জানেন; আমরা বলি, গবর্ণমেণ্টের এ কার্য্য ভাল হয় নাই।

ভাল হয় নাই, কেননা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ভাল হয় নাই, কেননা বেন্থামের হিতবাদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সতীদাহে দোষাধিক্য দেখা যায় না। ভাল হয় নাই, কেননা হর্বট স্পেন্সরের সমস্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ইহাতে দোষ দেখা যায় না। বরং রাজবিধির দ্বারা ইহা রহিত করায় দোষ দেখা যায়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল দেখাইয়াছেন, যে, যে সকল কার্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রধানতঃ কেবল নিজের, তাহার উপর সমাজের অথবা রাজবিধির হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে। যে সকল বিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্যের অনিষ্ট নাই, তাহা স্ব স্ব প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করা উচিত। সহমরণ উঠাইয়া দেওয়ায় হিন্দু বিধবার কি লাভ

---

* তিস্রঃ কোট্যার্দ্ধকোটীচ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারংযানুগচ্ছতি॥

হইয়াছে?—তাহাদের দুর্দ্দশার কি তারতম্য হইয়াছে? এই মাত্র যে, তখন এক দিন পুড়িত, এখন সমস্ত জীবন পুড়িতে থাকে। তখন পুড়িয়া মরিতে পাইত,—এখনও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে পায় না।

মৃণ্ময়ী* ।

কোন কোন দার্শনিক বিয়োগান্ত আখ্যায়িকাকে দোষাবহ এবং অনিষ্টকর বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন, মনুষ্য চরিত্রের একটী নিয়ম এই যে, পুনঃ পুনঃ ভাবোত্তেজনে ভাবপ্রাখর্য্যের হ্রাস হইয়া যায়। যদি সেই ভাব, কার্য্যে পরিণত হইতে পায়, তাহা হইলে ভাবপ্রাখর্য্য হ্রাস হইয়া যায় বটে, কিন্তু কার্য্য-পারগতার বৃদ্ধি হয়; সুতরাং কোন অনিষ্ট হয় না। ভাবোদ্দীপন হইতে কার্য্যানুস্মৃতির নিরোধ না হইলে, প্রথমে যে কার্য্য করিতে প্রখর ভাবোত্তেজনের আবশ্যক হইত, অভ্যাস নিবন্ধন, পরে অতি দুর্ব্বল ভাব হইতেই তাহা সমুৎপন্ন হয়। অবশেষে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন ভাব ব্যতিরেকে অথবা অতি অল্প ভাবেই আমরা কার্য্য করিতে পারি। সুতরাং ভাবপ্রাখর্য্যের হ্রস্বতানিবন্ধন কোন ক্ষতি হয় না। বিয়োগান্ত উপন্যাস পাঠে ভাবোত্তেজিত হয়, অথচ তাহার কার্য্য হইতে পায় না—ভাবপ্রাখর্য্য কমিয়া যায়, কার্য্যপারগতা বৃদ্ধি হয় না। বিয়োগান্ত উপন্যাস অথবা নাটকের বিরুদ্ধে, এই আপত্তি অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এ আপত্তি সমর্থন করি না।

এ সংসারে আমরা, দিবা রাত্র শত সহস্র বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহাতে অবশ্য ভাবোদ্রেক হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা হইতে কার্য্যানুস্মৃতি ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং

---

*মৃণ্ময়ী। কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ। শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। মূল্য ১।০।

বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা হইতে যে অনিষ্টাশঙ্কা করি, তাহা মনুষ্য-জীবনে অপরিহার্য্য। আমাদের নিরর্থক ভাবোত্তেজন এত অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে যে, দুই চারি দশ খানা বিয়োগান্ত উপন্যাস পড়া না পড়ায় উল্লিখিত অনিষ্টের ক্ষতি বৃদ্ধি সম্ভবে না। সাগরগর্ভে যখন শয্যা পাতিয়াছি, তখন শিশিরপাতে অনিষ্টাশঙ্কা করার ন্যায় হাস্য-জনক আর কি হইতে পারে? কথিত আছে, ইংলণ্ডে কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। যে দিবস তাহাকে টাইবর্ণের বধ্যভূমিতে যাইতে হয়, সে দিবস অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। অপ-রাধী মরিতে চলিয়াছে. অথচ শরীরে বৃষ্টি লাগিলে পাছে কফ্ লাগে, এই ভয়ে, সে ব্যক্তি একটী ছত্রের প্রার্থনা করিয়াছিল। বিয়োগান্ত উপন্যাস হইতে অনিষ্টাশঙ্কাও এইরূপ।

দ্বিতীয়তঃ সংসার সুখ-দুঃখময়—মিলন আছে, বিয়োগও আছে। কেবল সুখের ভাগটা দেখাইলে, কেবল মিলনান্ত উপন্যাস লিখিত হইলে, সংসারের একদেশ মাত্র প্রদর্শিত হয়।

তৃতীয়তঃ, মিলনান্ত উপন্যাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না গ্রন্থ বন্ধ করি, নায়ক নায়িকাকে ভুলিয়া যাই। তাঁহাদের মিলন হইল, তাঁহারা সুখী হইলেন—আর তাঁহাদের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন কি? বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা পড়িয়া দুঃখিত হই, আপনা ভুলিয়া যাই এবং সে ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। হেলেনার প্রেম, জুলিয়েটের প্রেমাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; কিন্তু এ দুই জনের জন্য পাঠ-কের মনে যে ভাবোদ্রেক হয়, তাহার অনেক তারতম্য আছে। এক খানি গ্রন্থ বন্ধ করি, আর হেলেনাকে ভুলিয়া যাই—শেক্সপীয়রের কবিত্বকে ধন্যবাদ দিই বটে, কিন্তু হেলেনাকে ভুলিয়া যাই। অপর গ্রন্থখানি শেষ করিয়া, জুলিয়েটকে ভুলি না—কবিকে ভুলিয়া যাই, কিন্তু জুলিয়েটকে কখন ভুলি না। শেক্সপীয়র কেমন কবি, এ কথা পাঠকের মনে হয় না; পাঠকের মনে হয়, জুলিয়েট বড় দুঃখিনী! —বড় হতভাগিনী! জুলিয়েটের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব দিতে, পাঠকের ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছা ক্ষণস্থায়ী নহে। জুলিয়েট মন হইতে

যায় না, সে ইচ্ছাও মন হইতে যায় না। মানব হৃদয়ের কোমলতা সম্পাদনের জন্য, মনুষ্য জীবনের মহত্ব সাধনের জন্য, এরূপ আত্মাদর, এরূপ আত্মবিসর্জ্জনের ভাব যে হৃদয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহা বাঞ্ছনীয়। পরের দুঃখে আমরা যতটুকু দুঃখিত হইতে পারি, তাহাতেই মঙ্গল আছে। সময়ে সে ভাব দুর্ব্বল হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার কার্য্যের অবসান হয় না। ক্রমে ঐ ভাব, ঐ পরদুখকাতরতা হৃদয়ের সঙ্গে জড়াইয়া যায়, হৃদয়ের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ভাববেগ মন্দীভূত হইলেও, তন্নিবন্ধন অনিষ্ট হয় না, কেননা যেমন ভাবের বেগ হ্রাস হয়, তেমনই হৃদয়ের কোমলতা বৃদ্ধি হয় তাহাতেই বলি, বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা আবশ্যক, বাঞ্ছনীয়, আদরণীয়।

অতএব কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ লিখিত হইবার আদৌ প্রয়োজন ছিল না। যখন কপালকুণ্ডলা প্রথম বাহির হইল, তখন অনেক অল্পবুদ্ধি লোকে এরূপ ভরসা করিয়াছিল যে, সত্বরেই ইহার দ্বিতীয় ভাগ বাহির হইবে। যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা শেষ হইয়াছে। নায়ক নায়িকার মিলন যে সুখের হইবে না, ভগবতী বিল্বপত্র গ্রহণ না করিয়াই ত তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন; এবং গ্রন্থের আরও দুই এক স্থলে বঙ্কিম বাবু ইহার আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। তবে দামোদর বাবু গায়ে পড়িয়া মিলন করাইতে আসিলেন কেন? আমাদের বোধ হয়, বঙ্কিম বাবুর নামের সঙ্গে নিজের নাম লাগাইতে পারিলে, গ্রন্থ অনেক বিক্রয় হইবে, এই আশায় দামোদর বাবু এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

দামোদর বাবুর গ্রন্থের দোষ গুণ সম্বন্ধে কোন কথাই এখনও বলা হয় নাই। তাহা এক্ষণে বলিতেছি। গ্রন্থ খানিতে প্রশংসা করিবার অনেক জিনিষ আছে। স্থানে স্থানে এরূপ মনোহর, হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে যে, আমরা তাহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ, গ্রাম্যতাসম্বন্ধ-

বর্জ্জিত এবং উপন্যাসের বিলক্ষণ উপযোগী। রচনাভঙ্গী অধিক স্থলেই প্রশংসনীয় এবং আড়ম্বর শূন্য। সত্যানুরোধে বলিতে হইতেছে, এ গ্রন্থে অনেকগুলি দোষও আছে। লেখক অতি সামান্য হইলে, সে সকল আমরা ধরিতাম না। লেখক ক্ষমতাপন্ন বলিয়াই, ভবিষ্যতে তাঁহার লেখনী হইতে অতি সুন্দর গ্রন্থ বাহির হইতে পারে, এরূপ ভরসা আমরা করি বলিয়াই, সে সকল দোষ দেখাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

এ গ্রন্থে এতগুলি নূতন লোকের সমাগম হইয়াছে যে, ইহাকে আমরা কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ বলিতে সম্মত নহি। সকল গ্রন্থেরই নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র থাকা বিধেয়। মৃণ্ময়ী যখন কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ, তখন কপালকুণ্ডলার কেন্দ্রই মৃণ্ময়ীর কেন্দ্র হওয়া উচিত। তাহা হয় নাই। কপালকুণ্ডলার অনেকগুলি লোক, এ ব্যাপারে দেখা দিয়াছেন বটে, কিন্তু কেমন উদাসীন ভাবে। তাঁহারা, এ ব্যাপারে লিপ্ত নহেন—কেবল অনুরোধে পড়িয়া, প্রণামির টাকাটী হাতে করিয়া, যেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে মৃণ্ময়ী, কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ হয় নাই;—যেন, একটি নূতন কাহিনী লিখিত হইয়াছিল, তাহাকে জোর করিয়া, ধরিয়া বাঁধিয়া, কপালকুণ্ডার ঘাড়ে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কপালকুণ্ডলার নায়ক, নবকুমার শর্ম্মা; মৃণ্ময়ীর নায়ক, তাঁহার বন্ধু।

নবকুমারকে মৃণ্ময়ীর নায়ক বলিতে আমরা সম্মত নহি কেন? উত্তর, দামোদর বাবু তাঁহাকে নায়ক করেন নাই—সে প্রাধান্য দেন নাই। মৃণ্ময়ীতে, নবকুমারের কথা এবং কার্য্য এত অল্প এবং এত সামান্য যে, অনুগ্রহ করিয়াও তাঁহাকে নায়ক বলা যায় না। যেখানে নবকুমারের সহিত দেখা হইল, সেই খানেই দেখিলাম, নবকুমার পরের হাত ধরিয়া হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া বেড়াইতেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে একবার যখন দেখা দিলেন, তখন, কখনও তাঁহার বন্ধুর হাত ধরিয়া, কখনও চিরপাপিষ্ঠা পদ্মাবতীর উপর

ভর দিয়া। আবার যখন জেহাঙ্গীর সাহ, পদ্মাবতীর কাছে শেষ বিদায় লইতে আসিলেন, তখন দেখি, নবকুমার শর্ম্মা, "দিনহীন কাঙ্গালেয় মতন এক পাশে দাঁড়ায়ে" আছেন। মৃণ্ময়ীতে নবকুমারের কথা আছে বটে, কিন্তু না থাকিলেও চলিত। বোধ হয় যেন, নবকুমারের কথা না থাকিলে এ গ্রন্থ, কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ বলিয়া পরিচিত হইতে পায় না, এই জন্য নবকুমারকে এখানে ধরিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। ধয়িয়া আনয়ন করার দরুন, নবকুমারও বড় নাস্তানাবুদ, খানে খারাব্ হইয়া গিয়াছেন। আর সে নবকুমার নাই। কপালকুণ্ডার নবকুমার, বিদ্বান, ভদ্রলোক, বিজ্ঞ, ধীরপ্রকৃতিক এবং পরোপকারী;—যাহার সঙ্গে পরিচয় হইবে, সেই প্রশংসা করিবে, সেই শ্রদ্ধা করিবে, সেই ভক্তি করিবে। দামোদর বাবুর নবকুমারকে, যাঁহার ভাল লাগে, তিনি প্রশংসা করুন, কিন্তু কেহ কোন কালে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয না। ইনিও ভদ্রলোক বটেন, কিন্তু এ ভদ্রতা অন্য প্রণালীর। আমেরিকার মিং উড, স্বামীর মৃত্যুতে যারপর নাই দুঃখিতা হইয়া অনেক প্রাণনাথ-প্রাণ ধন-সম্বলিত কাতরোক্তির পর লিখিয়াছেন— "আমার স্বামী অতি ভদ্রলোক ছিলেন। আমার প্রণয়ীর সহিত তিনি এক গৃহে বাস করিতেন, অথচ তাঁহাদের দুই জনে কখন বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই।" মৃণ্ময়ীর নবকুমার এইরূপ প্রণালীর ভদ্রলোক।

কথাটা, বোধ করি, পরিষ্কার হইল না। আমরা বুঝাইতেছি। নবকুমারের বন্ধু যখন, তাঁহার নিকটে পদ্মাবতীকে পুনর্গ্রহণ করিবার কথাবার্ত্তা কহিলেন, তখন নবকুমার বলিলেন—"পদ্মাবতী যবনী বলিয়া আমার তাদৃশ আপত্তি নাই।" কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুর * পক্ষে ইহার অপেক্ষা অধিক আপত্তির কারণ আর

* হিন্দুশাস্ত্র মতে যবনান্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, কিন্তু যবনী অভিগমন করিলে হইতে পারে না।

কি হইতে পারে ? যে নবকুমার কৃতোপকারিণী বিবাহিতা পত্নীকেও সমাজের এবং আত্মীয় কুটুম্বের মুখাপেক্ষা করিয়া আদর করিতে পারেন নাই, সেই নবকুমারই যে, তাঁহার বন্ধুর অসার যুক্তিতে ভুলিয়া এমন কথা বলিবেন, এ আশা আমরা করি নাই; সেই নবকুমারই যে, সহস্র পুরুষোপভুক্তা বেশ্যার মুখে দুই চারি বার 'প্রাণেশ্বর' 'প্রাণনাথ' শুনিয়া, গলিয়া জলেরও অধিক হইয়া যাইবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। দামোদর বাবুর মনে থাকিলে থাকিতে পারে যে, আর একদিন যখন পদ্মাবতী নবকুমারের কাছে কাতর ভাবে স্নেহ ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন নবকুমার সদর্পে বলিয়াছিলেন—"আমি যবনীজার হইতে পারিব না।"

যে সময়ের এ কাহিনী, সে সময়ে, মুসলমানের একাধিপত্য সত্ত্বেও হিন্দুসমাজ, হিন্দুসমাজই ছিল। সে সময়ে কোন হিন্দুযুবার মুখ হইতে, বিশেষতঃ নবকুমারের ন্যায় লোকের মুখ হইতে, এরূপ অত্যাশ্চর্য্য চমৎকার সভ্যতার কথা বাহির হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। পদ্মাবতী অনুতাপ করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু অনুতাপের উপর এতটা ভর দেওয়া ভাল নহে। ভিকার-অব-ওয়েকফিল্ড পড়া পণ্ডিতে, এবং নবকুমারের ন্যায় বিচক্ষণ লোকে অনেক প্রভেদ।

পদ্মাবতী নবকুমারের পত্নী ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে কি ?—ধর্ম্মভ্রষ্টা, সমাজচ্যুতা, মুসলমানী, মুসলমানের উপপত্নী, মুসলমানের পরিত্যক্তা উপপত্নী। এমন পত্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিতে ভদ্র লোকে পারে না। বঙ্কিম বাবুর নবকুমার পারেন নাই। তার পর, প্রত্যাখ্যানের কারণ বৃদ্ধি হইয়াছে বৈ কমে নাই। পদ্মাবতীর ষড়যন্ত্রেই নবকুমার, প্রাণাধিকা পত্নীকে হারাইয়াছেন। যে মৃণ্ময়ী, আসন্ন মৃত্যু হইতে নবকুমারের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, যে মৃণ্ময়ীকে বিবাহ করিয়া নবকুমার জীবন আলোকিত করিয়াছেন, যে মৃণ্ময়ীকে হারাইয়া নবকুমারের জীবন অন্ধকার হইয়াছে, সেই মৃণ্ময়ীর প্রাণনাশের যে কারণ, তাহাকে কি নবকুমার ভাল

বাসিতে পারেন? দামোদর বাবুর নবকুমার মানুষ নহেন;—তিনি, হয় দেবতা, না হয় পিশাচ।

আবার যে দিন জেহাঙ্গীর বাদসাহ, লুৎফ উন্নিসাকে দেখিবার জন্য সপ্তগ্রামে আসিলেন, সে দিন নবকুমার, আরও ভদ্রতার পরিচয় দিলেন। উপপতির সঙ্গে গোপনে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য পদ্মাবতী স্বামীকে (নবকুমারকে) তফাৎ হইতে বলিলেন। নবকুমারও বিনাবাক্যব্যয়ে—বোধ করি, কর্ত্তব্যানুরোধে—উঠিয়া গেলেন। তার পর আবার বেশ পরিষ্কার ভাবে জেহাঙ্গীরের সঙ্গে পদ্মাবতীসম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তাও কহিলেন, জেহাঙ্গীর পদ্মাবতীকে কেমন ভাল বাসেন, তাহা বসিয়া বসিয়া শুনিলেন। নবকুমার, নিরীহ লোক হইতে পারেন, কিন্তু ভদ্রলোক কখনই নহেন।

দামোদর বাবুর হাতে পড়িয়া, নবকুমার শর্ম্মা যেমন বিকৃত হইয়াছেন, তেমনি অনেকে হইয়াছেন। পদ্মাবতীতে, কই আর সে গর্ব্ব নাই। যে গর্ব্ব, প্রেমভিক্ষা করিতে আসিয়া, প্রাণাধিকের পদপ্রান্তে লুটাইতে লুটাইতেও গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে গর্ব্ব মুছিয়া গিয়াছে। সময়ে, শোকে, দুঃখে, প্রণয়ে, মনুষ্যহৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু একেবারে "স্থূলেই ভুল" হইয়া যায় না। আবার যে পদ্মাবতী আপন মুখে পেষমনের কাছে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আতাউল্লা হইতে জেহাঙ্গীর বাদসাহ পর্য্যন্ত যত উপপতি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কাহাকেও ভালবাসেন নাই, সেই পদ্মাবতীই আবার জেহাঙ্গীরকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন—যেমন তেমন ভালবাসা নয়, একেবারে যা-নয় তাই গোছ হইয়া উঠিয়াছে। আইভানহোর সম্বন্ধে রেবেকা যাহা ভাবিয়াছিলেন; জগৎসিংহকে আয়েষা যাহা বলিয়াছিলেন; প্রতাপকে শৈবলিনী যাহা বলিয়াছিল, পদ্মাবতী—যে পদ্মাবতী জেহাঙ্গীরকে সিংহাসনবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন নাই, সেই পদ্মাবতী, জেহাঙ্গীরকে তাহাই বলিতেছেন। সে কথার মর্ম্ম এই;—তোমায় আর দেখা দিব না, তুমি আর

আমায় দেখিতে চাহিও না, চিঠি পত্র লেখালেখিরও আর প্রয়োজন নাই, কেন না আমার ন্যায় স্নেহশালিনী রমণীর বেগবান হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। দামোদর বাবুর গ্রন্থে বিলক্ষণ আমোদ আছে।

কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির ছবি, অবিকল চিত্রিত হওয়া উচিত। তাহার ব্যভিচারে পাপ আছে। ভবিষ্যতে লোকে ভ্রমে পতিত হইতে পারে। দামোদর বাবুর গ্রন্থ পড়িয়া, ভবিষ্যতে কাহারও ভ্রম জন্মিবে কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু এরূপ কার্য্য দোষাবহ। পদ্মাবতীকে আগ্রা হইতে শেষ বিদায় দিবার সময় জেহাঙ্গীর শাহ, অজস্র অশ্রুপাত করিয়াছেন, এবং "বঁধু আমি তোমা বই আর কার নই" রকমের অনেক কথা বলিয়াছেন। আমরা স্পষ্ট বুঝিয়াছি, জেহাঙ্গীর সাহ পদ্মাবতীকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, তাহাকে ছাড়িবার লোক জেহাঙ্গীর সাহ ছিলেন না। ছাড়িয়া দিলে, পদ্মাবতী সুখী হইতে পারে সত্য; কিন্তু পরের সুখের মন্দিরে আত্মসুখকে বলি প্রদানের মহত্ত্ব, জেহাঙ্গীরের ছিল না। তিনি নূরজেহানের রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে আপন আয়ত্ত করিবার জন্য, তাহার স্বামীকে বধ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই;—তেমন উন্নত চরিত্রের লোক, তিনি ছিলেন না। তিনি মনে করিলেই পদ্মাবতীকে আয়ত্তে রাখিতে পারিতেন। তবে যে দেহবদ্ধ ভোগাসক্তি জেহাঙ্গীর সাহ ইচ্ছা পূর্ব্বক অভিলাষের ধনকে, বিলাসের উপকরণকে, প্রিয়তমা বেগমকে, অপরকে বিলাইয়া দিলেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। দামোদর বাবুর গ্রন্থে জেহাঙ্গীরকে দেখিয়া, তাঁহাকে ইতিহাসের জেহাঙ্গীর সাহ বলিয়া আমরা চিনিতে পারিলাম না।

আবার দিল্লীর বাদসাহ—যাঁহার অবরোধে লক্ষ লক্ষ সুন্দরী উপপত্নী ছিল, সেই ভারত-সাম্রাজ্যের মুসলমান অধীশ্বর যে সামান্য লোকের ন্যায়, একজন ভূতপূর্ব্ব উপপত্নী আহ্বানে, রাজকার্য্য ফেলিয়া, নূরজেহানকে ফেলিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, বঙ্গদেশের এক নিভৃত প্রান্তস্থিত এক সামান্য পল্লীগ্রামের

এক সামান্য গৃহ পর্য্যন্ত আসিলেন এবং সেই উপপত্নীর নবপ্রেম পাত্রের সহিত এক মন প্রাণ হইয়া আত্মীয়তা প্রকাশ করিলেন— এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিয়া, সমকক্ষের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিলেন, ইহাও নূতন কথা বটে। ছেলে বেলায় ঠাকুরমার কাছে শুনিতাম, এক মালিনী মন্ত্রপূত-বটিকা দ্বারা অনেক রাজপুত্রকে গাড়ল করিয়া রাখিয়াছিল। এতদিনে জানিলাম, সে কথা মিথ্যা নহে।

দস্যু দল সম্বন্ধে যত কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে "আমার গুপ্ত কথা" নামক সুদীর্ঘ উপন্যাস-বর্ণিত দস্যু দলের বিবরণের অনেক সাদৃশ্য আছে। যে কেহ উভয় গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তিনিই সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন; অতএব তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়া, আমরা, পাঠকের সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। মৃণ্ময়ী যখন 'গুপ্ত কথার' পরে লিখিত হইয়াছে, তখন, সুতরাং বলিতে হইতেছে যে, হরিদাস উত্তমর্ণ এবং দামোদর বাবু অধমর্ণ।

আর একটি কথা বলিয়া আমরা এ সমালোচন শেষ করিব। গ্রন্থকারের সহৃদয়তা নাই। নবকুমার শর্ম্মা এমন কি মহাপাতক করিয়াছিলেন যে, দামোদর বাবু, তাঁহাকে বেশ্যার প্রণয়াসক্ত করাইলেন? পুণ্যবানের অধঃপাত দেখিতে আমাদের বড় দুঃখ হয়। আবার পদ্মাবতী এমন কি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন যে, তিনি বেশ্যাবৃত্তিতে যৌবন অতিবাহিত করিয়া, বৃদ্ধ বয়সে স্বামীপ্রেম লাভ করিলেন। পাপের দণ্ড হওয়া উচিত। পদ্মাবতী দুই চারি বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, দুই চারি বার 'প্রাণনাথ' 'প্রাণেশ্বর' বলিয়াছেন, তাহা জানি; চক্ষের জল যে ভাল জিনিষ, প্রাণনাথ বেশ সরস কথা, তাহাও জানি; কিন্তু ইহাতে আজীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আপন হৃদয়ের পবিত্রতায়, একজনকে অযথা ভাল বাসিয়াছিল বলিয়া, বিশুদ্ধমতি আলিস * আঠার

* A character in Lord Lytton's novel, Alice or the Mysteries.

বৎসর কাল কাঁদিল—সুখের সমাধির উপর বসিয়া সমস্ত যৌবন বুকের ভিতর জ্বলন্ত হুতাশন বহিল; অযথা ভাল বাসিয়াছিল বলিয়া সরলা কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইয়া মরিতে হইল; অযথা ভালবাসিয়া শৈবলিনী জাগিতে ঘুমাইতে বুকে করিয়া নরক বহিল। আর পদ্মাবতী, আজীবন পাপহ্রদে ডুবিয়া থাকিয়াও শেষে স্বর্গে গেল। পবিত্রতার মাহাত্ম্য, অপবিত্রতার নীচতা যিনি বুঝেন না, তাঁহার রুচির প্রশংসা করিব না। ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যিনি জানেন না, তাঁহাকে সহৃদয় বলিব না। পাপের জয় দেখিতে, আমরা নারাজ। সাধুর অধঃপতন দেখিতে, আমরা ততোধিক নারাজ। যে গ্রন্থকার, এ সকল দেখাইতে আসেন, তাঁহার উপর আবার ততোধিক নারাজ। *

---

* 'মৃণ্ময়ী' সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু একটা গুরুতর রহস্য উপস্থিত করিয়াছেন। 'কপালকুণ্ডলার নূতন সংস্করণে মৃণ্ময়ীকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু একার্য্যটা বড়ই অন্যায় করিয়াছেন। এখন আর 'মৃণ্ময়ীকে' কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ বলিয়া পরিচিত করা যায় কেমন করিয়া, বলুন দেখি? কুসংস্কারান্ধ বাঙ্গালী পাঠক এখন হয় ত 'মৃণ্ময়ী' পড়িতে ভয় করিবে। তাহাদের মনে হইতে পারে যে, কপালকুণ্ডলা বুঝি প্রেতযোনিপ্রাপ্ত হইয়া সাহিত্য-সংসারে আবার উকিঝুকি মারিতেছে। মৃত্যুটাও না কি অপমৃত্যু, তাই এ আশঙ্কা করিতেছি।

রসসাগর।

সর্ব্বমত্যন্তংগর্হিতং—কোন বিষয়েই বেজায় বাড়াবাড়ি ভাল নহে। যাহা ভাল, যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা লইয়াও বাড়াবাড়ি করিতে গেলে প্রায় মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। অতিদর্পে লঙ্কার কি হইয়াছিল, অতিমানে কৌরবের কি হইয়াছিল, অতিদানে বলীর কি হইয়াছিল, সে সকল প্রাচীন কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আবার অতিঅহঙ্কারে ফ্রান্সের কি হইল, অতিব্যয়ে তুর্কির কি হইতেছে, এ সকল আধুনিক কথা কাহা-রও অবিদিত নাই। অথচ দর্প, অহঙ্কার, মান, দান, অর্থব্যয়, ইহার সকলগুলিই, পরিমাণবহির্ভূত না হইলে,—স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে হইলে, নিন্দনীয় নহে। কিন্তু ভাল জিনিষও অযথা পরিবর্দ্ধিত হইলে যে কুফল প্রসব করে, তাহার সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল—ধর্ম্মভাব। ধর্ম্মভাব যে ভাল জিনিষ, ইহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। পরিণতিবাদের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা যায়, যে মনুষ্যজীবনের প্রয়োজননিচয়ের সঙ্গে ধর্ম্ম-ভাবের উপযোগিতা আছে। মনুষ্যের এমন অনেক অভাব আছে, যাহা ধর্ম্মভাব ব্যতীত অন্য কিছু দিয়া পূর্ণ করা যায় না। এই বিজ্ঞানপ্রধান, নাস্তিকতাপ্রবণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এই ধর্ম্মভাব অনেক শোকে সান্ত্বনা, অনেক বিপদে ভরসা, অনেক সাধু উদ্যমের জীবনী, অনেক সদনুষ্ঠানের মূল, অনেক পরিতাপ-তপ্ত হৃদয়ের শান্তিনিকেতন, অনেক পথভ্রান্ত

---

* রসসাগর অর্থাৎ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্ত এবং কতিপয় পাদপূরণ। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

জীবন-পোতের ধ্রুবতারা। এ হেন ধর্ম্মভাবেও যখনই কিছু বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছে, তখনই কুফল ফলিয়াছে। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল, হিস্পানিয়া; উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ।

ধর্ম্মভাবের অযথা পুষ্টিনিবন্ধন ভারতবর্ষে যে সকল কুফল ফলিয়াছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, ভারতের ইতিবৃত্ত লিখিত হয় নাই, ভারতের কৃতী সন্তানদিগের জীবনবৃত্ত নাই। কেন নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মভাব অযথা বলবান হইয়া উঠিল। কিসে স্বর্গ হইবে, কিসে মুক্তি হইবে, কি করিলে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইবে, কি করিলে আর এ পৃথিবীতে আসিতে হইবে না—এই সকল চিন্তা মনকে ব্যাপৃত করিল। পরকাল পরকাল করিয়া লোকে পার্থিব বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িল। পরলোকই সর্ব্বস্ব, ইহলোক কিছুই নহে—কেবল ভোজের বাজি, কেবল মায়ার মোহ—এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। লোকে দেখিল, এ সংসারের সুখ, সুখ নহে—তাহা অসম্পূর্ণ, দুঃখবিমিশ্রিত; এ সংসারের দুঃখও দুঃখ নহে—তাহা অল্পকাল মাত্র স্থায়ী। পার্থিব জীবন বিগতপ্রমাণ, সুতরাং পার্থিব পদার্থমাত্রই—ধন, জন, গৌরব, খ্যাতি—সবই ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর, অসার, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। যাহার উপর শ্রদ্ধা নাই, তাহার মহিমাকীর্ত্তন কে করিয়া থাকে? সেই জন্য ভারতে ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি ছিল না। সেই জন্য প্রাচীন কালের ঘটনাবলি নিবিড় অন্ধতমসাচ্ছন্ন।

আজকাল ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি আমরাও ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিতেছি, জীবনবৃত্ত লিখিতে শিখিতেছি। কিন্তু মূর্ত্তি গড়িব কি দিয়া? উপকরণ কৈ? যে সকল বর্ণে প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতে হইবে, সে সকল বর্ণ কৈ? যে আলোকে ফোটোগ্রাফ উঠিবে, সে আলোক কৈ? বিগত ঘটনার সম্বন্ধে, মৃত মহাত্মাদিগের জীবন সম্বন্ধে, কাগজ কলমে লেখাপড়া কিছু নাই। যে দুই চারিটা কথা আছে, লোকের মুখে, লোকের

গল্পে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বাজে গল্প, কতকগুলি বাজারে গল্প, কতকগুলি আষাঢ়ে গল্প। যদি কিছু সত্য কথা এই গল্প-রাশির মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তাহা বাছিয়া বাহির করা সুকঠিন। সেই জন্য, এক্ষণে যাঁহারা মৃত মহাত্মাদিগের জীবনী সংকলন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা প্রায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।

রসসাগরের জীবনচরিত হরিমোহন বাবু যে টুকু সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষেপ,—এত সংক্ষেপ, যে তাহা পাঠ করিয়া কাহারও তৃপ্তি হইতে পারে না। তাহার সার মর্ম্ম এই ; জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী বাগোয়ানের সন্নিহিত বাড়েবাঁকা গ্রামে বাঙ্গালা ১১৯৮ সালে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত, পারসী, উর্দ্দু, হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরে তাঁহার বিবাহ হয়, সেই সূত্রেই ভবিষ্যতে তথায় বাস। মহারাজা গিরীশচন্দ্র রায় তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সভাসদ্ নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া 'রসসাগর' উপাধি প্রদান করেন। রসসাগরের এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান ছিল। পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শান্তিপুরে তাঁহার দুহিতার বিবাহ দেন, এবং গঙ্গাতীর বলিয়া জীবনের শেষ ভাগ জামাতৃগৃহেই অতিবাহিত করেন। এই স্থানে ১২৫১ সালে তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। হরিমোহন বাবু ইহার অধিক আর কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বরং তিনি যে হাল রীতি অনুসারে সওয়া এগার জন কালিদাস, সাড়ে তের জন ভবভূতি প্রমাণ করিতে ব্যগ্র না হইয়া, যে দুই চারিটা কথা সংকলন করিতে পারিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রশংসা পাইবার যোগ্য। তিনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর কিছু পাইবারও বোধ হয় উপায় নাই। বাবু শ্যামধর রায় প্রকাশিত

"রসসাগরের জীবন চরিতেও" ইহার অধিক বড় কিছু নাই— 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতেও' নাই।

হরিমোহন বাবু রসসাগরের দুই চারিটা কার্য্য আখ্যাত করিয়া শেষে লিখিয়াছেন,—"রসসাগরের এরূপ কার্য্য অনেক আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার অবতারণা করিলাম না।" এইটি বড় অন্যায় কাজ করা হইয়াছে। রসসাগরের সম্বন্ধে যত গুলি গল্প হরিমোহন বাবুর জানা আছে, সব লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল। যদ্দ্বারা নায়কের চরিত্র উৎকৃষ্ট রূপে লোকের হৃদঙ্গম হয়, সেই উৎকৃষ্ট জীবনবৃত্ত; এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে মনুষ্যচরিত্র যেমন বুঝা যায়, বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য দেখিয়া তেমন যায় না। লর্ড মেকলে এক স্থলে লিখিয়াছেন,—মহাকাব্য রচয়িতাদিগের মধ্যে যেমন হোমর, দৃশ্যকাব্য প্রণেতাদিগের মধ্যে যেমন সেক্ষপীয়র, বাগ্মী-কুলে যেমন ডিমস্থিনিস্, জীবনচরিত লেখকদিগের মধ্যে তেমনি বস্ওয়েল—অতুল, অদ্বিতীয়। একথা সত্য; কিন্তু কেন? অনেক মহৎ লোকে জীবনবৃত্ত লিখিয়াছেন—বস্ওয়েল অতি ক্ষুদ্র লোক, অথচ কেন তিনি সর্ব্বপ্রধান? এই জন্য যে, জন্সনের কথা যেখানে যেটুকু পাইয়াছেন, হাঁচি কাশি পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। রসসাগরের কার্য্যকলাপ বাহুল্যভয়ে গোপন করা, হরিমোহন বাবুর পক্ষে অতি অন্যায় কাজ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সমালোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত "পায় পায় পায় না" এবং "পায় পায় পায়" এই দুইটি সমস্যার পূরণ সম্বন্ধে আমাদের একটা কথা আছে। ঈশ্বরগুপ্ত বলেন, এই শ্লোকদ্বয় ভারত-চন্দ্রের রচিত। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক রামগতি ন্যায়রত্নও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু হরিমোহন বাবু লিখিয়াছেন, যে "এক্ষণে আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছি, যে রসসাগরই উক্ত কবিতাদ্বয়ের প্রণেতা।" বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন, উত্তম; কিন্তু প্রমাণ গুলি কৈ?

ঈশ্বর গুপ্ত এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় দুই জন লোক যখন অন্য মতাবলম্বী, তখন আমরা কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া হরিমোহন বাবুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি না। হরিমোহন বাবুর কথায় আমাদের অবিশ্বাস নাই—অনুসন্ধান করিয়াই তাঁহার ঐ রূপ বিশ্বাস অবশ্য হইয়াছে - কিন্তু এরূপও ত হইতে পারে যে, যে সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া উক্ত কবিতাদ্বয় রসসাগরের বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে, সেই সকল যুক্তি লইয়াই অপরে অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। কারণ গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, পাঠকদিগকে আপন আপন সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

রসসাগরের কবিত্ব সম্বন্ধে হরিমোহন বাবুর মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাই। রসসাগর যে প্রখর বুদ্ধিশালী লোক ছিলেন এবং তাঁহার অনেক জানা শুনা ছিল, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। কেবল জানা শুনা নহে, যাহা তিনি জানিতেন, তাহা বিলক্ষণ তৎপরতার সহিত ব্যবহার করিতে পারিতেন। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি এক, কবিত্ব আর। রস-সাগরকে আমরা প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া স্বীকার করি না। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও বড় উচ্চাসন দিতে পারি না। হরিমোহন বাবু তাঁহার নায়ককে এক স্থলে থিওডোর হুকের সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, রসসাগর কোন অংশেই হুকের অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ইহা স্বীকার করায় আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু হরিমোহন বাবু অবশ্য জানেন, যে থিওডোর হুক ইংলণ্ডে প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া পরিগণিত নহে, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও তাঁহার স্থান আছে কি না, সন্দেহ—থাকিলেও তত উচ্চ নহে। তবে, কবিসুলভ কতকগুলি গুণ রসসাগরের ছিল। সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য দর্শনে তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখরা ছিল। তিনি অসাধারণ সত্বরতার সহিত মিল রাখিয়া পদবিন্যাস করিতে পারিতেন কিন্তু দ্রুতরচনায় যে দোষ ঘটে, তাহাও

ঘটিত। হরিমোহন বাবু যে এক স্থলে বলিয়াছেন, যে দ্রুত-রচনা নিবন্ধন তাঁহার সমস্যা পূরণে ছন্দের দোষ দৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু কবিত্বের দোষ দৃষ্ট হইত না, সেটা ভুল। উদাহরণ,—

প্রশ্ন, "টুক্ টুক্ টুক্।"

রসসাগর পূরণ করিলেন,

কৈলাসেতে বাস সদা স্থির ভগবতী।
পৃথিবীতে আগমন তিন দিন স্থিতি॥
যুদ্ধকালে সুর অরি পেতে দিল বুক।
অসুরের কাঁধে পদ টুক্ টুক্ টুক্॥

এরূপ কদর্য্য কবিতার সমালোচনা করিতেও আমাদের লজ্জা হয়। কৈলাসে বাসের সঙ্গে পৃথিবীতে আগমনের কি সম্বন্ধ? যে কেহ কৈলাসে বাস করে, তাহাকেই পৃথিবীতে আসিতে হইবে, এমন কোন কথা আছে কি? যদি না থাকে, তবে পৃতিবীতে আগমনের কথায় বাসস্থানের পরিচয় দিবার কি আবশ্যক ছিল? "স্থির ভগবতী"—কৈলাসে বাস করিলেই কি স্থির হইয়া না থাকিলেই চলে না? তবে পৃথিবীতে আসা কেমন করিয়া হয়? "তিন দিন স্থিতি"—তিন দিনের অধিক থাকিবেন না, ভগবতী এরূপ কোন একরার লিখিয়া দিয়াছেন না কি? চরণের লৌহিত্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য পৃথিবীতে তিন দিনই থাকুন আর তিন মাসই থাকুন, তাহাতে কি? তিন দিন থাকার কথা না বলিলে কি চরণের লৌহিত্য মুছিয়া যাইত? "পেতে দিল বুক"—তবে কাঁধে টুক্ টুক্ কেন?

ঐ প্রশ্নেরই আর একটা পূরণ দেখ;

পথ মধ্যে দাঁড়াইয়া পরমা সুন্দরী।
ভুবনমোহন রূপ যেন বিদ্যাধরী॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ শশী জিনি মুখ।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা টুক্ টুক্ টুক্॥

পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা হইয়াছে, এই কথাটা বলা উদ্দেশ্য ; কিন্তু তজ্জন্য বিদ্যাধরী হইবার কি প্রয়োজন ছিল ?—কমল জিনিয়া অঙ্গ হইবার কি প্রয়োজন ছিল ?—মধ্যপথে দাঁড়াইবারই বা কি প্রয়োজন ছিল ? যে সুন্দরী মধ্যে পথে না দাঁড়াইবে, তার ঠোঁট পান খেয়ে রাঙ্গা হইতে পাইবে না, অলঙ্কার শাস্ত্রের এমন কোন বিধান আছে না কি ? এরূপ কোন কবিপ্রসিদ্ধি আছে কি, যে, যে স্ত্রীলোক মধ্যপথে না দাঁড়াইয়া পথের ধারে দাঁড়াইবে, তার ঠোঁট পান খেলে সবুজ হবে ; যে জানেলার পাশে দাঁড়াইবে, তার নীল হবে ; যে ঘাটের পথে দাঁড়াইবে, তার শ্বেত হবে ; যে পুকুরের ধারে দাঁড়াইবে, তার আশ্‌মানি হবে ; আর যে কোথাও না দাঁড়াইয়া আপন মনে মাথা গুঁজে চলে যাবে, তার——তার কালো হওয়াই উচিত। এখনও কি হরিমোহন বাবু বলিবেন, তাঁহার নায়কের সমস্যাপূরণে কবিত্বের দোষ কোথাও দৃষ্ট হইত না ?

আবার কতকগুলি পূরণ আছে, তার ভাব রসসাগরের নিজের নহে—সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত। দুই একটা উদাহরণ দেখুন ;

১নং। প্রশ্ন—কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?

রসসাগর পূরণ করিলেন,

তোমার চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো,
পরের বাড়ী হবিষ্যি।
আমার নাই লক্ষ্মী দীন দুঃখী,
কতকগুলি কুপুষ্যি ॥
যখন ঠেক্‌বে পা, ঘুচ্‌বে লা,
লা হয়ে যাবে মনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
কাট পাথরে বিশেষ কি ? ॥

এই পূরণ, যে কবিতার নকল, সেটা এই —

মানুষীকরণরেণুরস্তি তে পাদয়োরিতি কথা প্রথীয়সী।
ক্ষালয়ামি তব পাদপঙ্কজে নাথ! দারুদৃশদোস্তু কা ভিদা॥

"ক্ষালয়ামি তব পাদপঙ্কজে," এই কয়টি কথা একটু মনোযোগ করিয়া পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে যে, রসসাগর নকল করিতে গিয়া মূল ভাবের সৌন্দর্য্য অনেকটা বিনষ্ট করিয়াও ফেলিয়াছেন।

নং ২। প্রশ্ন—গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল।

রসসাগরের পূরণ,—

হেন উপকার আর না করিবে কেহ।
বিরহিনী বলেন কল্যানে থাক রাহু॥
যদি বল শশী খেয়ে মন্দানল হলো।
গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল॥

মূল কবিতাটী এই—

বিরহানলসন্তপ্তা তাপিনী কাপি কামিনী।
লবঙ্গানি সমুৎসৃজ্য গ্রহণে রাহবে দদৌ॥

নং ৩॥ প্রশ্ন—শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী?

রসসাগরের পূরণ,—

শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়িলে রণভূমি।
কান্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী॥
শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সবার আগে আমি।
শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী॥

মূল কবিতা এই—

ধনুষি নিপুণশিক্ষা বেদমন্ত্রেষু দীক্ষা
জনকনৃপতিগেহে চাগ্রতো মে বিবাহঃ।
ইদমনুচিতমস্মিন্নগ্রজে বিদ্যমানে
শমনভবনযানে যত্নবানগ্রগামী॥

এক্ষণে রসসাগরের গুণের পরিচয় লওয়া যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরসাগরের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাগুলি সে কথা সমর্থন করিবে।

প্রশ্ন—রমণীর গর্ব্বে পতি ভয়ে লুকাইল।

রসসাগর পূরণ করিলেন,

লক্ষ্মীনারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে।*
তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে॥
তৃণকাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল।
রমণীর গর্ব্বে পতি ভয়ে লুকাইল॥

প্রশ্ন—বড় দুঃখে সুখ।

রসসাগরের পূরণ,

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চকা কহে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হতে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ॥

দুই চারিটী কবিতা এরূপ আছে যে, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়, যে রসসাগর বিলক্ষণ রসিক লোক ছিলেন। উদাহরণ

প্রশ্ন—তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে।

রসসাগরের পূরণ,—

করি, হরি, হরিণী, মরাল সুধাকর।
পিক আদি তোর নামে ফরিদী বিস্তর॥
এই কথা দূতী গে জানায় শ্রীরাধারে।
তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে॥

রসসাগর যে বিলক্ষণ ব্যঙ্গপটু লোক ছিলেন, তাহারও পরিচয় আমরা বিলক্ষণ পাইয়াছি। উদাহরণ,—

প্রশ্ন—হাটের নেড়ে হুজুক চায়।

রসসাগর পূর্ণ করিলেন,—

উকীল খোজে মকদ্দমা, কোকিল বসন্ত গায়।
অগ্রদানী নিত্য গণে, কোন্ দিনে কে গঙ্গা পায়॥

---

* লক্ষ্মী, অর্থাৎ তণ্ডুল; নারায়ণ, অর্থাৎ জল।

সাধু খোজে পরমার্থ, লম্পট খোজে বেশ্যালয়।
গোলমালেতে রেস্ত মেলে, হাটের নেড়ে হুজুক চায়॥

প্রশ্ন—অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল।—

পূরণ,—

হারে বিধি নিদারুণ কত খেলা খেল।
সংসারের যন্ত্রণা যত হাবাতের ঘাড়ে ফেল॥
বেতো রোগী কেঁদে বলে কোন দিন বা ভাল।
অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল॥

হরিমোহন বাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, রসসাগর অবকাশ কালে যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, তাহা সর্ব্বাংশে অতি সুন্দর হইত। সেরূপ রচনা কেবল একটী এই গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায়। একদা রসসাগর মহারাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, শেষে নিজ স্ত্রীর উক্তিতে মহারাজের নিকট নিম্ন লিখিত শ্লোকটী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নিবেদন করে দাসের দাসী রসসাগরেরর রসিকা।
করুণা ছেড়েছে নাথের নাথ, মন্দির ছেড়েছে মূষিকা॥
আভরণচয় করেছি বিক্রয়, কাঞ্চন রহিত নাশিকা।
পাইব আশায় তথাপি নাশায় ধারণ করেছি ইসিকা॥

এই রচনায় যে বিলক্ষণ কারিগরি আছে, তাহাতে সংশয় নাই। রসসাগর যে বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন লোক, তাহা আমরা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু হরিমোহন বাবু তাঁহার নায়কের পক্ষ হইতে যেরূপ কবিত্বের দাবি করিয়াছেন, সে ক্লেম আমরা মঞ্জুর করিতে পারি না। হরিমোহন বাবুর লিখিত প্রশংসা পাঠ করিতে করিতে অনেক সময়ে আমাদের বস্‌ওয়েলকে মনে পড়ে।

রসসাগরের অনুকূলে বলিবার একটা কথা আছে। হরিমোহন বাবু সে কথা বলেন নাই।, তিনি না বলুন, আমরা তাঁহার হইয়া বলিয়া দিব। আপন কবিত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার

সুবিধা বোধ হয় রসসাগরের কখন হয় নাই। কবিহৃদয়ের নিভৃত বিজনে যে সকল গভীর ভাব বিহার করিয়া বেড়ায়, তেমন ভাব যদি রসসাগরের হৃদয়েও খেলিয়া থাকে, তাহা তিনি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত যে সকল কবিতা আমরা পাইয়াছি, তাহা অন্যের ফরমায়েশে অনুসারে রচিত। এ সকল জিনিষ যে ফর্‌মায়েশ ভাল হয় না, ইহা সকলেই জানেন। 'প্রাইজ পোয়েম" কস্মিন্‌কালে উচ্চ দরের জিনিষ হয় নাই! ফর্‌মায়েশী গান প্রায় ভাল হয় না। সেই জন্য এমনও হইতে পারে, যে এই সকল কবিতা রসসাগরের প্রকৃত পরিচয় স্থল নহে। এই সকল কবিতায় যত খানি ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছে, হয় ত রসসাগরের প্রকৃত ক্ষমতা তদপেক্ষা অনেক অধিক। অধিক হউক, অল্প হউক, গ্রন্থখানি আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সময় বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া বোধ হইবে না।

বাঙ্গালির কল্পনাপ্রিয়তা।

ইউরোপীয়েরা কবিত্বের উপর অনেকটা হতাদর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ এবং যত্ন বিজ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত। কাব্যের এইরূপ অযথা অনাদর দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। সে দিবস একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিতেছিলেন,—বিজ্ঞানের অনুশীলন কর, তাহা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া জড়-প্রকৃতিকে সারসর্ব্বস্ব করিয়া তুলিতেছ কেন? মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সুতরাং যেমন বুদ্ধিবৃত্তির, তেমনি হৃদয়েরও অনুশীলন হওয়া কর্ত্তব্য। ইউরোপে তাহা হইতেছে না।

আমাদিগের দেশেও তাহা হইতেছে না। ইউরোপ এক-দিকে ছুটিতেছে; আমরা তাহার বিপরীত দিকে যাইতেছি। প্রাচীন গ্রাসে যে কয়েকটি রস কাব্যের আধার বলিয়া পরি-গণিত ছিল, আধুনিক ইউরোপেও তাহাই আছে; কিন্তু প্রাচীন গ্রাসের পাঁচটি ভূতের স্থানে এক্ষনে পয়ষট্টিটা দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। প্রচীন ভারতে যে পাচটি ভূত ছিল, এখনও সেই ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম আছে, কিন্তু রসের যারপর নাই ছড়াছড়ি। মূলরসের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই বটে, কেননা যাহা প্রাচীন এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাহার উপর বাক্যব্যয় করা হিন্দুসন্তানের পক্ষে পঞ্চ মহাপাতক মধ্যে গণ্য; কিন্তু শাখা প্রশাখায় বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছে। প্রাচান ভারতে নয়টি রস ছিল। শান্তিরস তাহার মধ্যে একটি। সেই শান্তিরসের একটি শাখা, ভক্তিরস। আমাদের দেশে এখন একা ভক্তিরসই চৌষট্টিবিধ।* ইউরোপীয়েরা

* হরিভক্তিরসামৃত সিন্ধু দেখ।

প্রাচীন রসেই সন্তুষ্ট; যত কারিগরি, তাহা ভূতের উপর। আমরা প্রাচীন ভূতেই সন্তুষ্ট; কারিগরি কেবল রস লইয়া। ইউরোপে কেবল বিজ্ঞান—কেবল অম্লজন, জলজন, আর যবক্ষার-জন; আমাদের দেশে কেবল রস, কেবল কল্পনা, কেবল কবিত্ব—কেবল নির্ম্মল চন্দ্রিকা আর প্রফুল্ল মল্লিকা, কোকিলের কূজন আর ভ্রমরের গুঞ্জন, কবরীভূষণ আর কাঁচলিকষণ, বিরহিণী বালা আর যৌবনের জ্বালা।

কল্পনার এইরূপ অযথা অনুশীলন এবং বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ অযথা অনাদর দেখিয়া অনেকে ভীত। বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া অনেকে মাথা কপাল ভাঙ্গিয়া মরিতেছেন, তবু বিজ্ঞান হয় না। আবার 'কল্পনায় আর প্রয়োজন নাই, অনুগ্রহ করিয়া ইতি কর' বলিয়া গলা ভাঙ্গিতেছেন, তবু কল্পনা ফুরায় না—কাব্যের উপর কাব্য, নাটকের উপর নাটক, উপন্যাসের উপর উপন্যাস, তাহার উপর নবন্যাস—কল্পনার ছড়াছড়ি। যে কেহ দুই একখানা পুস্তকের দুই এক পাতা উল্টাইয়াছেন, অমনি সাহিত্যের আসরে নামিয়া 'সখিরে সখি' করিতে বসেন।

কেহ না মনে করেন যে আমরা কাব্যের নিন্দা করিতেছি। নিন্দা করা দূরে থাক্, কাব্যের আমরা বিশেষ পক্ষপাতী এবং কবিদিগকে আমরা যার পর নাই ভক্তি করিয়া থাকি। ইহা আমাদের বিশ্বাস আছে, যে হোমর এবং বর্জ্জিল যত লোকের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইয়া থাকেন, এত আর কেহ না। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যকে পাপ হইতে বিরত রাখিতে, পুণ্যের পথে উৎসাহিত করিতে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধনে, পশুভাবের সংযমনে, কবির ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে আর কেহই পারেন না। ধার্ম্মিকের ধর্ম্মোপদেশ প্রায় ভাসিয়া যায়—প্রায় এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যায়; কিন্তু কবির কথা হৃদয় ভেদ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি উপদেশ দেন, যে 'বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, নরক ভোগ

করিতে হইবে,’ তাহা হয় ত শুনিয়াও শুনি না, কেন না ধর্ম্মোপদেশকের মুখে নরকটা কেবল কথার কথা মাত্র। নরকের ভাব মনোমধ্যে স্পষ্টীকৃত করা ধর্ম্মোপদেশকেয় সাধ্যাতীত। কিন্তু কবির উপদেশ সেরূপ নহে। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে নরকে যাইতে হইবে, এরূপ অকার্য্যকর অর্থবিহীন বাক্য কবি প্রয়োগ করিলেন না; সেই নরকের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইলেন। আমরা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে, ভীতিসংকুচিতচিত্তে দেখিলাম, গভীর নিশায়, পৃথিবীর লোক ঘুমাইতেছে, কিন্তু স্কট্‌লণ্ডের রাজ্ঞীর চক্ষে ঘুম থাকিয়াও নাই; তেমন নিদ্রার অপেক্ষা জাগরণ ভাল। গভীর নিশায় লেডি ম্যাক্‌বেথ দীপ হস্তে করিয়া, চক্ষে নিদ্রা আছে অথচ চলিয়া বেড়াইতেছেন। নিদ্রায় তাঁহার শান্তি নাই, কেন না তিনি বিশ্বস্তের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, নিদ্রিতকে জোর করিয়া চিরনিদ্রিত করিয়াছেন। কবির সঙ্গে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সেই হতভাগিনীর পাপ-আশীবিষদংশিত মনের উদ্ভ্রান্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিলাম—ভীত হইলাম। পার্শ্বে চিকিৎসক ছিলেন, তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, হায়! হায়! যাহা তুমি জানিয়াছ তাহা তোমার জানা উচিত ছিল না,—রোমাঞ্চ হইল। সামান্য পরিচারিকা, সে উঠিয়া বলিল, “সমস্ত শরীরের গৌরবের জন্যও আমি এমন হৃদয় বক্ষের ভিতর চাহি না”—দাসীর মুখের কথা শুনিয়া হৃদয়ের ভিতর হৃদয় ডুবিয়া গেল।* কবির নিকট বিদায় লইলাম, কিন্তু এ অপূর্ব্ব নরকচিত্র হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিল। এমন জীবন্ত উপদেশ স্মৃতি থাকিতে ভুলা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, পাপের কদর্য্যতা দেখাইতে এবং পুণ্যের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে, কবি অদ্বিতীয়। কাব্য ভাল।

কাব্য ভাল, কিন্তু কথা কি জান, কোন বিষয়েরই বেজায়

---

* Macbeth. Act. v. scen I.

বাড়াবাড়ি ভাল নহে। সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং। কাব্য ভাল, কাব্য থাক, কিন্তু তাই বলিয়া আর কিছু না থাকিবে কেন? সকলই কিছু কিছু চাই, নতুবা সংসার চলে না। কেবল কোমলতা ভাল নহে—স্ত্রীলোকের সংসারে বাতাসের ভর সহে না; কেবল কাঠিন্যও ভাল নহে পুরুষের সংসারে বিলিব্যবস্থা থাকে না। স্ত্রীলোকে পুরুষে যে সংসার গঠিত তাহাই ভাল, তাহাই চলে। সমাজেও তাই। জগতের একই নিয়ম; যে নিয়মবলে ফলটি খসিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, গ্রহ, উপগ্রহ ধূমকেতু, অখিল সংসার সেই নিয়ম ডোরে বাঁধা! যে নিয়ম ক্ষুদ্র পরিবারে, সেই নিয়ম বৃহৎ সমাজেও। স্পার্টা কেবল পুরুষের সমাজ, কেন না স্পার্টার স্ত্রীলোকেরাও পুরুষ—স্পার্টান সমাজ চলিল না; বিদ্যুতের ন্যায়, ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া অমনি নিবিয়া গেল। বঙ্গদেশ কেবল স্ত্রীলোকের সমাজ, কেন না বঙ্গদেশের পুরুষেরাও স্ত্রীলোক. সুতরাং বাঙ্গালার অদৃষ্টে কি আছে তাহা ভাবিতে গেলে পেটের ভাত চাল হইয়া যায়। স্ত্রীলোকে পুরুষে মিলিয়া যে সমাজ গঠিত হয়, সেই সমাজই চলে। কোমলে কঠিনে মিলন হইলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইল। সৌন্দর্য্যের সহিত বলের সামঞ্জস্যই প্রকৃতির চরম উন্নতি। যৌননির্ব্বাচনের সাহায্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, প্রকৃতিকে সেই দিকে লইয়া যাইতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সংসার বলীয়ান্ হইতেছে; যৌননির্ব্বাচন সংসারকে সুন্দর করিতেছে। যাহা সুন্দর এবং বলীয়ান্, তাহাই চলে, কেবল সুন্দর চলে না, কেবল বলীয়ান্ও চলে না। কেবল সৌন্দর্য্য লইয়া ইতালি মারা গিয়াছে কবির দুঃখ এই যে, ইতালি তুমি এত সুন্দর হইয়াছিলে কেন? কেবল সৌন্দর্য্য লইয়া ভারতবর্ষ মারা গিয়াছে—ভারতীয় কবিও এই দুঃখ করিতে পারেন। কেবল সৌন্দর্য্য লইয়া ওয়াল্টার স্কটের কাব্য সকল মারা গিয়াছে—তাহাতে প্রচুর সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু বল নাই; সুতরাং সে সকলের বড় একটা আদর নাই। আবার কেবল বল লইয়া

স্পার্টা মারা গিয়াছে, কেবল বল লইয়া ক্ষত্রিয়েরা মারা গিয়াছেন। দুই চাই। ইহাই প্রকৃতির উপদেশ; এবং প্রকৃতির উপদেশ সকলেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; নতুবা মঙ্গল নাই। আমরা প্রকৃতির উপদেশ গ্রহণ করিতেছি না; যাহাতে বল হইবে তাহার কোন অনুষ্ঠানই নাই, সুতরাং আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু গ্রহণ যে করিতেছি না, তাহার কি কোন কারণ নাই? জগতে কিছুই নিষ্কারণ নহে; আমাদের কল্পনাপ্রিয়তার কি কোন কারণ নাই? অবশ্য আছে; এবং সে কারণ কি, তাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটা কথার মীমাংসা করা উচিত। কবি কাহাকে বলা যায়?

কবিত্বের প্রধান উপকরণ, অনুভাবকতা এবং কল্পনা। অনুভাবকতা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে কেহ কোন ভাবের বেগ, ভাবের তরঙ্গ হৃদয়মধ্যে অনুভব করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ ভাল বাসিয়াছেন অথবা ঘৃণা করিয়াছেন, তিনিই কবি। যে কেহ এক দিন দুঃখ ভাবিয়া, মনে মনে বলিয়াছেন 'আজিকার রজনী যেন আর পোহায় না,' যে কেহ সুখ ভাবিয়া একদিন মনে মনে বলিয়াছেন, 'সূর্য্যদেব তোমার পায়ে পড়ি, একটু শীঘ্র শীঘ্র পাটে গিয়ে বসো বাপু,' তিনিই কবি। যে কেহ হাসিয়াছেন অথবা কাঁদিয়াছেন তিনিই কবি; এবং এ সুখদুঃখের সংসারে কে হাসে নাই—কে কাঁদে নাই? অতি পরিষ্কার আকাশেও কালো মেঘ দেখা যায়, আবার নিবিড় জলদের কোলেও সৌদামিনী হাসে; তেমনি সহস্র সুখের মধ্যেও একটু দুঃখ থাকে, আবার সহস্র দুঃখের মধ্যেও একটু সুখ থাকে। সুতরাং অন্তরে অন্তরে কবি সকলেই। তা ঠিক; তবে কি না, যার হৃদয় কঠিন তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে না—সে ব্যক্তি ভাব অনুভব করে বটে, কিন্তু তার হৃদয়ে তরঙ্গ নাই, কেন না তরঙ্গ কাঠিন্যের ধর্ম্ম নহে। আর যার হৃদয় কোমল, যার হৃদয় তরল, ভাবের বাতাস বহিলেই তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে, কেন না তরঙ্গ তরলতারই ধর্ম্ম—তরলতার

ভঙ্গী বিশেষের নামই তরঙ্গ। এই তরঙ্গ যার উঠে এবং ইহার মূর্ত্তি ভাষার বর্ণে যে আঁকিতে পারে, সেই প্রকাশ্যে কবি। যে পারে না, সে কবি হইয়াও কবি নহে। আবার অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য। বাঙ্গালি অশিক্ষিত, অপরিমার্জ্জিত-বুদ্ধি, কুসংস্কারান্ধ, সুতরাং বাঙ্গালির কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালি কল্পনাপ্রিয়। কিন্তু এ কল্পনা, এ অনুভাবকতা কোথা হইতে আসিল ?

প্রাচীন আর্য্যগণ ধর্ম্মের বন্ধনে হিন্দুসমাজকে অষ্টপৃষ্ঠে ললাটে বাঁধিলেন। বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য স্বাধীন ভাবে হইতে থাকিলে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য থাকে না, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিকেও সেই বন্ধনে বাঁধিতে হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি পাকাইয়া পাকাইয়া বৃহৎ এক রজ্জু নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া, রজ্জুর দুই মুখ স্বহস্তে ধরিয়া বসিলেন। যদি কেহ কখন বন্ধন মুক্ত হইবার উপক্রম করিল, অমনি রজ্জু টানিয়া তাহাকে ব্যথিত করা হইল—তাহার মান গেল, কুল গেল, সম্ভ্রম গেল, ইহলোক গেল, পরলোক গেল। অগত্যা সকলকে বন্ধন স্বীকার করিতে হইল। শাস্ত্রের উপর, অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাক্যের উপর বাক্যব্যয় করা পঞ্চমহাপাতক তুল্য গণ্য হইল। যাহা কিছু শাস্ত্রে লেখা আছে তাহাই সত্য ; তাহাতে শতসহস্র জাজ্বল্যমান ভ্রম থাকিলেও তাহা অভ্রান্ত। দুইটী কথা, যাহা সরল বাঙ্গালা ভাষায় বলিলে মূর্খেও পরস্পর বিরোধী বলিয়া বুঝিতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকিলেই দুইটিই সত্য হইয়া দাঁড়াইল। সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে, নচেৎ নিরয়ে পচিতে হইবে। যে সকল স্থল বুঝিতে পার না, তাহাও বিশ্বাস কর। বুঝিতে যে পার না, সে তোমার বুদ্ধির দোষ ; তন্নিবন্ধন শাস্ত্রের অগৌরব কেন করিবে ? সব মিটিয়া গেল। ষোল কলা সম্পূর্ণ হইল।

কালে বিশ্বাস আসিল, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহাই শাস্ত্রে আছে, এবং যাহা কিছু শাস্ত্রে আছে, তাহাই সত্য। যাহা

শাস্ত্রে নাই তাহাই মিথ্যা। এইরূপ বিশ্বাসে সুফল ফলে না। এইরূপ বিশ্বাসে আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার পুড়িয়াছিল। * আরিস্ততলের উপর এইরূপ অচলা ভক্তি ছিল বলিয়া স্কুলমেন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেতর জাতিরা বিদ্যাসাম্রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত। কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্যানুশীলন ছিল। কিন্তু নূতন সত্যের পথ বন্ধ. জ্ঞাতব্য সত্যের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট; সুতরাং ব্রাহ্মণের বুদ্ধির প্রাখর্য্য কেবল কথার মারপেঁচে পরিণত হইল। বুদ্ধির প্রাখর্য্য যে ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু তাহাতে কার্য্য হইল না। তমাস্ আকুইনাস্, দন স্কোতস্ প্রভৃতি প্রখর বুদ্ধিশালী হইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। সূচির তীক্ষ্ণাগ্রভাগে কয়জন এঞ্জেল নাচিতে পারে? — এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে এঞ্জেলেরা মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃতি পার না হইয়া যাইতে পারে কি না? — ঈশা যখন মেরির গর্ভে ছিলেন, তখন বসিয়াছিলেন, কি শুইয়া ছিলেন, না দাঁড়াইয়াছিলেন? এইরূপ বৃথাতর্কে তাঁহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইল, কেন না আরিস্ততলের উপর বাক্যব্যয় করা মহাপাপ। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের বুদ্ধি এইরূপে নষ্ট করিলেন। পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। যে শৃঙ্খল পরের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কালে আপনারাও তাহাতে বাঁধা পড়িলেন। বুদ্ধির পথে কাঁটা পড়িল; কল্পনার পথ মুক্ত—সুতরাং মনের চাঞ্চল্য সেই পথে নিযুক্ত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

কবির চক্ষে কিছুই নির্জ্জীব নহে। পৌরাণিক অবস্থায় (Mythological stage or Volitional stage,) লোকে প্রাকৃতিক কার্য্যমাত্রকেই ইচ্ছাবিশিষ্ট জীবের কার্য্য বলিয়া বোধ

---

* উক্ত পুস্তকাগার দাহের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। প্রচলিত বিশ্বাস এস্থলে প্রকটিত হইল।

করে। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি সকলকেই তাঁহারা সজীব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আমরা যেমন মনে করি, সূর্য্য উদয়াস্ত হইতে বাধ্য; আমাদের নীরস, শুষ্ক চিন্তায় যেমন সকলই নিয়ম, সকলই নিয়তি, তাঁহাদের তেমন ছিল না; সুতরাং যখন পশ্চিম গগন সায়াহ্নের সৌখিন শোভায় শোভিত হইত, তখন বৈদিক আর্য্য অস্তগমনোন্মুখ দিনমণিকে করজোড়ে বলিতেন,—আবার এসো হে; আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে, আবার কখন্ দেখা পাব হে! এইরূপ বিশ্বাস ছিল বলিয়া, তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই কাব্যের সৌরভ, কল্পনার হিল্লোল আছে—তাহাই কবিত্বের আলোকে উদ্ভাসিত। এই কারণে, বালকের বাক্যে, বালকের কার্য্যে অনেক সময়ে এমন কবিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যে, বয়স বিবেচনা করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। আমাদের ধর্ম্ম আমাদিগকে বালক করিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, মেঘ, বিদ্যুত, বায়ু, অগ্নি, ক্ষিতি, অপ্, বৃক্ষ, লতা সকলকেই সজীব মনে করিতে আমরা বাধ্য, কেন না সকলেই আমাদের দেবতা। জননীর স্তন্যের সঙ্গে এই বিশ্বাস পান করিয়াছি, বাল্যকালে এই বিশ্বাসে দীক্ষিত হইয়াছি, শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, মানসিক বৃত্তিনিচয়ের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে ইহা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরিণত বয়সে বিজ্ঞানের সাহায্য পাই নাই;—মেঘকে দেবতা বলিয়াই বোধ থাকিল, বাষ্পরাশি মনে করিতে পারিলাম না; অগ্নিকে ব্রহ্ম বলিয়াই পূজা করিলাম, রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্র মনে করিতে পারিলাম না; ক্ষণপ্রভাকে চিরকাল দেবেন্দ্রাঙ্কস্থতা পলায়মানা দেবী মনে করিলাম, তড়িল্লতা মনে করিতে পারিলাম না। সুতরাং চিরকাল কল্পনার কার্য্য হইল। যে স্থলে কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ উপস্থিত হইল, সে স্থলে কল্পনা, শাস্ত্রের সাহায্য পাইল, ধর্ম্মের সাহয্য পাইল, বিশ্বাসের সাহায্য পাইল, আর দশজন লোকের সাহায্য পাইল, সুতরাং কল্পনার

জয় চিরকাল হইল। প্রত্যেক কলহে জয়লাভ করিয়া কল্পনা বলশালিনী হইল; হারিয়া হারিয়া বুদ্ধি নিস্তেজ, স্ফূর্ত্তিহীন, অবসন্ন, বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল।

সুখের শরৎ কালে শরৎসুন্দরীপূজা বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। কেবল শাক্ত, কেবল ভক্ত বলিয়া নহে, বঙ্গদেশে এ উৎসব সার্ব্বজনীন; এবং এ উৎসব কবিত্ব পরিপূর্ণ। এক প্রতিমাতেই কবিত্বের সীমা নাই। দশভুজা দশহস্তে দশ প্রহরণ ধরিয়া চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিতেছেন, বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে বাগ্‌দেবী সুকুমার পঙ্কজের উপর তদধিক সুকুমার চরণসরোজ বিন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ের পার্শ্বে কার্ত্তিকেয় এবং গজানন—সুন্দরের চরম এবং কুৎসিতের চরম। নিম্নে মহা দৈত্য মহিষাসুর বীরদর্পে বিকট দশনে অধর দংশিয়া অসি উত্থিত করিতেছে, দুর্জ্জয় সিংহ তাহাকে ভীম পরাক্রমে আক্রমণ করিতেছে। মস্তকোপরি দেবাসুরের অপূর্ব্ব যুদ্ধের অপূর্ব্ব চিত্র। অঙ্গনে ছাগ শোণিতের ধারা; সেই শোণিতে বিভূষিত হইয়া ভক্তিভাবপরিপ্লুত ভক্ত নাচিতেছে। এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলে হৃদয় মধ্যে মহান্ ভাবের তরঙ্গ বহেনা, এমন নীরস, শুষ্ক হৃদয় কার আছে? এ উৎসবে যে এক বার মাতিয়াছে—কোন্ বাঙ্গালির সন্তান মাতে নাই?—মিল্টন পড়ার কাজ তাহার হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর আবার আনুসঙ্গিক কবিত্ব আছে। বালকেরা স্নানাহার ভুলিয়া গিয়াছে, যুবকেরা আনন্দে মাতিয়াছেন; নববিকসিতা কুসুমরূপিণী বঙ্গকুলবধূ সুন্দর অলঙ্কারে সুন্দর দেহ সুন্দর করিয়া সাজাইয়া, বহু দিনের পর প্রিয়সম্মিলন হইবে এই আনন্দে চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন; প্রবাসী, এক বৎসরের দাসত্ব-যন্ত্রণা ভুলিবার আশায় উর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিতেছেন। বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্যের উপর উৎসাহ চাপা দিয়া আবার যুবা হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্গের আনন্দের সীমা নাই; বিচিত্র অট্টালিকায় এবং পর্ণকুটীরে, রাজপথে এবং অন্তঃপুরে, কেবল আনন্দধ্বনি

উঠিতেছে, কেবল হৃদয়ানুভূত উৎসাহ তরঙ্গ খেলিতেছে। পিতার কাছে পুত্র আসিতেছে, পুত্রের কাছে পিতা আসিতেছেন, প্রণয়িনীর কাছে প্রণয়ী আসিতেছে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব একত্র সমবেত হইতেছে—আনন্দের সীমা কি? এক মাস পূর্ব্ব হইতে বঙ্গবাসী যে দিনের আশাপথ চাহিয়াছিল, সেই দিন আসিয়াছে—এক মাস পূর্ব্ব হইতে যে ভাবের বহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, আজি তাহা একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কেবল ভক্তের বলিয়া নহে, সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়সাগরে, ভাবের প্রবল বাতাসে উচ্চ তরঙ্গ উঠিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে কেহ যে কোন ভাবের বেগ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন, তিনই কবি। দুর্গোৎসব বাঙ্গালিকে কবিত্বের পথে অনেকটা অগ্রসর করিয়াছে। বাঙ্গালির বার মাসে তের পর্ব্ব আছে; দুর্গোৎসব সর্ব্বপ্রধান বলিয়া কেবল ইহারই উল্লেখ করিলাম। বুদ্ধিমান পাঠককে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা এক্ষণে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালিকে যতটা কোমল করিয়াছে, এত বোধ হয় আর কিছুতেই নহে। এ ধর্ম্ম কোমলতাপূর্ণ, প্রণয়পূর্ণ মধুপূর্ণ—যশোদার বাৎসল্য, রাধিকার উগ্র অনুরাগ, কৃষ্ণের লীলা, ব্রজরাখালদিগের ভ্রাতৃভাব, গোপাঙ্গনাদিগের বিলাস চেষ্টা, বৈষ্ণবদিগের যে অংশ দেখ তাহাতেই মধু আছে। আর বৈষ্ণবধর্ম্মে যে সকল ভাব আছে, সে সকলই জীবন্ত—তাহাতে তরঙ্গ আছে, বেগ আছে, চাঞ্চল্য আছে। যশোদার বাৎসল্য জীবন্ত বাৎসল্য, কেন না হাজার হইলেও কৃষ্ণ নিজের পুত্র নহে। সুতরাং এ বাৎসল্যের সঙ্গে আশঙ্কা আছে। যশোদা পুত্রহীনা, কৃষ্ণ তাঁহার বহু আরাধনার ধন—বহু আরাধনায় যাহা লাভ হয় তাহার জন্য আশঙ্কাও অধিক। জন্মান্ধ যদি চক্ষু পায়, তাহার পক্ষে চক্ষু বড় আদরের ধন। অন্ধকারের মধ্যে যে আলোক পাইয়াছে, তাহার আলোক বড় অমূল্য। গোপাঙ্গনাদিগের

অনুরাগ জীবন্ত, কেন না এ রস পরকীয়, * সুতরাং উগ্র, তীব্র এবং বেগবান্। রাধিকার ভালবাসাও জীবন্ত, কেন না এ প্রণয়ের ভিতর ভয় আছে, লজ্জা আছে, বিপদ্ আছে, কলঙ্ক আছে, লুকাচুরি আছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত সকল ভাবই জীবন্ত। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, আগা গোড়া সবই মধুর, সবই সুন্দর, সবই কোমল! বঙ্গীয় কবিকুলতিলকগণ এই রসে মজিলেন; এই তরল ধর্ম্মের উপর কবিত্বের তরলতা ঢালিলেন— যাহা মধুর, সুন্দর, কোমল, তাহার উপর আরও মাধুর্য্য, আরও সৌন্দর্য্য, আরও কোমলতা চাপাইলেন; চাপাইয়া, কৃষ্ণরাধিকার প্রণয়ে এক অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি দিলেন। রাধিকার ত কথাই নাই, কৃষ্ণও এক অপূর্ব্ব জিনিষ হইয়া উঠিলেন। কখন যোগী সাজিয়া রাধিকার কুঞ্জে প্রেমভিক্ষা করিলেন, কখন রাধিকার মুখ রাখিবার জন্য শ্যামা সাজিলেন, এবং স্বয়ং রোগী হইয়া স্বয়ংই বৈদ্য হইলেন; আবার কখন মনের বেগে পায়ে ধরিয়া কাঁদিলেন,—

ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।

রাধিকা কখন গুরু মানে মাতিয়া কৃষ্ণকে ভৎ´সনা করিলেন,

হরি হরি! যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদং
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদং।

কখন আবার প্রেমে বিভোর হইয়া আদর করিলেন,

তুমি আমার
পরাণ অধিক, হিয়ার পুত্তলী,
এ দুটি আঁখির তারা।

---

* পূর্ব্বতন আলঙ্কারিকেরা স্বকীয়া নায়িকাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদিগের মতে পরকীয়াই প্রধান স্থলাভিষিক্ত। 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' দেখ।

একজন কবি, অনুপম 'মধুকর-নিকরকরম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীর সাজাইলেন, তাহার চতুর্দ্দিক্ সরস বসন্তের শোভাপূর্ণ করিলেন, তাহার ভিতর, ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল মলয় সমীরকে মৃদু মৃদু সঞ্চালিত করিলেন—হরি এইখানে বসন্তোৎসব করিবেন। হরি বসন্তোৎসব করিলেন না, প্রণয়োৎসবে ভঙ্গ দিয়া দূরে গেলেন। কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী সেই কোমল মলয় সমীরের অধিক নৈরাশ্য-কাতর স্বরে কাঁদিলেন—

কহত কহত সখি, বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।
নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ, প্রণয়িযুগলকে এইরূপে হাসাইয়া, এইরূপে কাঁদাইয়া, এইরূপে ভালবাসাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে এক অপূর্ব্ব রস করিয়া রাখিলেন। সে রস যদিও দেবদেবী লইয়া তবু তাহা সাধারণ লোকের সম্বন্ধকক্ষাতীত নহে, কেন না অমন সুখ, অমন দুঃখ, অমন হাসি, অমন কান্না সকলেরই আছে। দেব দেবীর নাম মাত্র, নতুবা বৈষ্ণব কবিরা মানবহৃদয়ের ভঙ্গী সকল চিত্রিত করিয়াছেন। যে বেগ বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে, সে বেগ তোমার আমার হৃদয়েও আছে, তবে কি না, আমরা তেমন করিয়া বলিতে জানি না। সকল হৃদয়ে আছে বলিয়া, সকলেই সে রস বুঝে, সকলের সঙ্গেই ইহার সম্বন্ধ আছে। চৈতন্যদেব আসিয়া সেই রসের তরঙ্গ তুলিলেন এবং সেই তরঙ্গে সমস্ত বঙ্গদেশকে নাচাইলেন। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, পাড়ায় পাড়ায়, গৃহে গৃহে, সেই রসের বিস্তার হইল। পৌত্তলিকতা মাত্রই কবির ধর্ম্ম। যে দেশে পৌত্তলিকতা আছে, সেই সেই দেশেরই লোক কিয়ৎপরিমাণে কবি। যে দেশে পৌত্তলিকতার অল্পতা অথবা অভাব লক্ষিত

হয়, সেই সেই দেশেই পরিমাণানুযায়ী কবিত্বের অল্পতা অথবা অভাব দেখা যায়। কোন মনুষ্যই একেবারে কবিত্বে বঞ্চিত হইতে পারে না; আজি পর্য্যন্ত সংসারে এমন কোন ধর্ম্মও প্রচারিত হয় নাই, যাহার ভিতর পৌত্তলিকতা নাই অথবা কালে পৌত্তলিকতায় পরিণত হয় নাই। বলিয়াছি ত, পৌত্তলিকতা কবির ধর্ম্ম; তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় কবিত্ব পরিপূর্ণ ধর্ম্ম যে দেশে প্রচলিত, সে দেশের লোক যে কিয়ৎপরিনাণে কবি হইবে তাহার বৈচিত্র্য কি?

আবার বৈষ্ণবধর্ম্ম অনুভাবকতামূলক, কেন না উহা ভক্তি-প্রধান। বঙ্গদেশের অন্যান্য সকল ধর্ম্মই প্রায় জ্ঞানপ্রধান অথবা কর্ম্মপ্রধান। চৈতন্যদেবকে ভক্তিমাহাত্ম্যের উদ্ভাবন কর্ত্তা বলিতেছি না; বোপদেব কৃত (?) শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিপ্রধান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যে রামানুজস্বামী এই রসের বিস্তার করিয়াছিলেন. তবে কি না চৈতন্যদেব ভক্তিরসকে ঘরে ঘরে চালাইলেন। চৈতন্যের বাহাদুরি এই পর্য্যন্ত। জ্ঞানকাণ্ড অথবা কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে অনুভাবকতার সম্বন্ধ অল্প; কিন্তু ভক্তির সহিত উহার অতি নিকট সম্বন্ধ, কেন না ভক্তি অনুভাবকতারই মূর্ত্তিবিশেষ। অনুভাবকতার সঙ্গে কবিত্বের সম্বন্ধ অতি নিকট; সুতরাং অনুভাবকতার অনুশীলন যাহাতে হয়, তাহাতেই কবিত্বের লাভ আছে। অতএব বাঙ্গালি যে কাব্যপ্রিয়, বাঙ্গালি যে কল্পনাপ্রিয়, তাহার অনেকটা নিন্দা প্রশংসায় বৈষ্ণবধর্ম্মের দাবি আছে।

পশুপূজা।

And they painted on the grave posts
Of the graves yet unforgotten,
Each his own ancestral totem,
Each the symbol of his household ;
Figures of the bear and reindeer,
Of the turtle, crane, and beaver.

Longfellow.

উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা এইরূপ করিয়া থাকে। অবিস্মৃত সমাধির সমাধিদণ্ডে তাহারা আপন আপন বংশের চিহ্নস্থানীয় পশু, পক্ষী, বা পাদপমূর্ত্তি চিত্রিত করে—কেহ ভল্লুক, কেহ হরিণ, কেহ পারাবত, কেহ বক, কেহ বিবর—কেহ সোমলতা, কেহ মাধবীলতা, কেহ শাল্মলী, কেহ বট, কেহ কিছু কেহ কিছু। কেবল সমাধিদণ্ডে প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া ক্ষান্ত থাকে, এরূপ নহে—যে পশু বা পক্ষী যে বংশের আভিজাতিক নিশানা, তদ্বংশীয় মাত্রের দ্বারা সেই পশু বা পক্ষী বহুসমাদৃত। যে লতা বা পাদপ যে পরিবারের পরিচায়ক, সেই পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা সেই লতা বা পাদপ বহুসম্মানিত। তাহারা তাহাদিগের সেই অর্দ্ধ সভ্য, অপরিমার্জ্জিত, কদর্য্য প্রণালীতে সেই সেই পশু বা পক্ষীর, লতা বা পাদপের অর্চ্চনা করে।

কেবল উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা বলিয়া নহে, নানা আকারে এই পূজাপদ্ধতি অনেকানেক অসভ্য এবং অর্দ্ধসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। কোন কোন সভ্য জাতির মধ্যেও আছে—দৃষ্টান্ত, ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতপ্রচলিত পশুপূজা একটু

স্বতন্ত্র প্রকৃতির ; সেই জন্য ভারতের পশুপূজার কথা আমরা স্বতন্ত্র করিয়া আলোচনা কবিব। যে সকল জাতি সভ্যতার উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগের মধ্যে এই আদিম অর্চ্চনাপদ্ধতির পূর্ব্বাস্তিত্বের এবং ক্রমবিলোপের চিহ্ন সকল লুপ্তপ্রায়, তবু একেবারে লুপ্ত নহে—এখনও অর্দ্ধ-লুক্কায়িত ভাবে বর্ত্তমান। কোথাও আচার ব্যবহারের অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছে। কোথাও ভাষাসাগরে, নিমজ্জিত শৈলের ন্যায় শৃঙ্গাগ্রভাগ মাত্র জাগাইয়া রহিয়াছে। যে সকল জাতি এককালে সুসভ্য হইতে সমর্থ হইয়াছিল ; কালক্রমে. নিয়তিবশে, আপন আপন কার্য্য সমাধান করিয়া পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান হইয়াছে, তাহাদিগের পরম্পরাগত আখ্যানাবলীতেও ইহার নিশানা জাজ্জ্বল্যমান। ম্যাকলেনান সাহেব দেখাইয়াছেন, যে মিসরবাসীদিগের মধ্যে, য়িহুদীদিগের মধ্যে, এবং রোমকদিগের মধ্যে 'ঈগল্' পক্ষী পূজিত ছিল।

কেন এরূপ হয়? সৃষ্টির উন্নততম, সর্ব্বপ্রধান, জ্ঞান-গৌরবান্বিত জীব মনুষ্য, অজ্ঞান ক্ষুদ্র পশুপদে ভক্তিভাবে নতশির—কেন এরূপ হয়? কেন বিশেষ বিশেষ জাতি কর্তৃক বিশেষ পশু বা পক্ষী দেবতানির্ব্বিশেষে ভক্তিভাবে পূজিত হয়? যে পশু আমরা আহারের জন্য বধ করি, চড়িবার জন্য বাহন করি, ক্রীড়ার জন্য হনন করি,—আবার কোন্ কুহকে পড়িয়া তাহাকেই পূজ্য বলিয়া অর্চ্চনা করি?

ইহার নানা প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। সচরাচর এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, যে কোন ভ্রান্তিসমুৎপাদক ঘটনা অথবা আদিম উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাপ্রণালীর কোন খেয়াল হইতে পশুপূজার উৎপত্তি। নতুবা স্থিরচিত্তে সজ্ঞান মনুষ্য অজ্ঞান পশুর প্রতি দেবভক্তি দেখাইবে, ইহা কোন রূপেই সম্ভবপর নহে।

এ প্রকার অদূরদর্শী ব্যাখ্যা আমাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পশুপূজা যদি কচিৎ কোন স্থলে, কচিৎ কোন জাতির

মধ্যে, কচিৎ কখন দৃষ্ট হইত, তাহা হইলেও একদিন বলিবার পথ থাকিত, যে উহা ভ্রান্তিমূলক। কিন্তু যখন সকল বা অনেক দেশেই পশুপূজার চিহ্ন উপলক্ষিত হয়, তখন উহা কখনই ভ্রান্তিসমুৎপাদক ঘটনার ফল হইতে পারে না। যাহা সর্ব্বদেশ-ব্যাপী, তাহা কখনই নিয়মের ব্যভিচার নহে—তাহাই নিয়ম। আর, আদিম অসভ্যদিগকে যে আমরা আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির জীব মনে করি, সেটা আমাদের ভুল। সত্য বটে, প্রভেদ অনেক, কিন্তু তাহা পরিমাণে—প্রকারে নহে। সত্য বটে, তাহাদের ভাষা অসম্পূর্ণ, তাহাদের জ্ঞান সংকীর্ণ; কিন্তু সেই অপূর্ণ ভাষা, সেই সংকীর্ণ জ্ঞান লইয়া তাহারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, তাহাদের অবস্থায়—সেই ভাষায়, সেই জ্ঞানে—তদপেক্ষা সঙ্গততর সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না। তাহা-দের সেই শিশু ভাষা যদি আমাদের ভাষা হইত, তাহাদের সেই সংকীর্ণ জ্ঞান যদি আমাদের হইত, তাহা হইলে আমরাও যে তাহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতাম, এ বিষয়ে সন্দেহ অতি অল্প। আর একটি বিশেষ গুরুতর কথা এই যে, পশুপূজাই বল, আর দেবপূজাই বল, ভ্রান্তি কখন কোন ধর্ম্মের মূল হইতে পারে না। ভ্রান্তি অসার, ভ্রান্তি বিষ, ভ্রান্তি মৃত্যু—ভ্রান্তি হইতে কখন জীবনী সঞ্চার হইতে পারে না। অথচ এই পশুপূজা পৃথিবীময় একদিন জীবন্ত ধর্ম্ম ছিল—এখনও কোথাও কোথাও আছে। যে কোন ধর্ম্মই হউক, তাহাতে অনেক ভ্রম থাকিতে পারে, ভ্রমপূর্ণ হইলেও হইতে পারে,—যেখানে আলোক, সেই-খানেই ছায়া—কিন্তু ভ্রম কখন কোন ধর্ম্মের জীবন হইতে পারে না, কখন কোন ধর্ম্মের মূল হইতে পারে না। এই সকল কারণে পশুপূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভ্রান্তিবাদ বা খেয়ালবাদে আমাদের আস্থা নাই।

পশুপূজার উৎপত্তি নিরূপণ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আলোক আমাদের অতি অল্পই আছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল, ম্যাকলে-

নান্ সাহেব পশু ও পাদপোপাসনা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকটা অন্ধকার অপসারিত হয়। সর্ জন্ লবকের "প্রাগৈতিহাসিক সময়" নামক গ্রন্থেও এ সম্বন্ধের দুই চারিটা কথা আছে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডীয় 'পাক্ষিক সমালোচন" পত্রে হর্বর্ট স্পেন্সরের লিখিত পশুপূজার উৎপত্তি বিষয়ক একটী নাতিবৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই গুলির উপর নির্ভর করিয়া আমরা পশুপূজার উৎপত্তি নির্দ্দেশের যত্ন করিব।

সর্ব্বত্রই দেখা যায়, লোকে বিশ্বাস করে, যে যখন মৃত্যু হয়, তখন দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ ঘটে, এবং দেহবিমুক্ত আত্মা অন্যত্র অবস্থান করে। মৃত ব্যক্তির আত্মা যে পৃথিবীতে দেখা দিতে আসিতে পারে এবং সময়ে সময়ে আসে, ইহাও অনেকের বিশ্বাস—অসভ্য বর্ব্বরের ত কথাই নাই, অতিসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকার অতিশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও এই বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখা যায়,—প্রমাণ, প্রেততত্ত্ববাদীগণ।* এই সকল দেহবিমুক্ত, পুনরাগত আত্মা যে প্রিয়জনের ইষ্ট এবং অপ্রিয়জনের অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম, এ বিশ্বাস অশিক্ষিতের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, বর্ব্বরদিগের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী—ভূতের ভয়ের অন্য কোন অর্থ নাই। যাঁহারা প্রথমা পত্নীর বিয়োগান্তে দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, যে তাঁহাদের মাতা বা ভগিনী পূর্ব্ববধূর সিন্দূরের কৌটা, কড়ির চুপড়ি, হাতের লোহ বলয় প্রভৃতি অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে রক্ষা করেন—ভয়, পাছে পূর্ব্ববধূর প্রেতাত্মা রাগ করিয়া কোন পারিবারিক অমঙ্গল সাধন করে। দ্বিতীয়া ভার্য্যা সতীনেরে ঝালে সব করিতে পারেন (জীবিতই হউক, আর মৃতই হউক, সতীন ত বটে), কিন্তু তাঁহার এমন সাহস নাই, যে সেই হাতের লোহা, কড়ির চুপড়ি সিন্দূরের কৌটার কোন প্রকার অসম্মান করেন—এমন সাহস নাই, যে

* The spiritualists.

অশুচি অবস্থায় সেই সকল স্পর্শ করেন,—ভয়, পাছে সেই 'কালামুখী' রাগে পড়িয়া এই পদ্মমুখীর অদৃষ্টে বৈধব্য দুঃখ বিধান করে। কেবল বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া নহে, মানুষ মরিলেও যে তাহার সহিত সম্বন্ধ ঘুচে না, আমাদের কার্য্যের দ্বারা যে প্রেতাত্মার সুখ, আহ্লাদ বা তৃপ্তি, দুঃখ, বিষাদ বা বিরাগ সংসাধিত হইতে পারে, এ বিশ্বাস সর্ব্বত্র বিদ্যমান। অসভ্যদিগের মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রবল। প্রেতাত্মার অনুকূলতা প্রতিকূলতার উপর আপনাদের সাংসারিক ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে,—পীড়ার সময়ে, শীকারে প্রবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে, এবং অন্যান্য অনেক সময়ে প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিয়া প্রসন্ন করিবার যত্ন করে। 'বেধ' নামক অসভ্য জাতি সম্বন্ধে বেইলি সাহেব লিখিয়াছেন যে,— যখনই প্রেতাত্মার সাহায্য প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই ইহারা একটী শর লম্বভাবে মাটিতে পুঁতিয়া ধীরে ধীরে তাহার চতুর্দ্দিকে নাচিয়া বেড়ায়, এবং গায়—

"মা মিয়, মা মিই, মা দেয়া,
তোপাং কইচেথি মিথিগান ইয়ন্দা ?"

"আমার দূরপ্রস্থিত বন্ধো, আমার দূরগত বন্ধো, আমার দেবতা,
তুমি কোথায় ভ্রমণ করিতেছ ?"

রোগাদিতে তাহারা এইরূপ করে। শীকারের পূর্ব্বে কখন কখন শীকারলভ্য মাংসের কিয়দংশ উদ্দেশে উৎসর্গ করে, এবং মনে মনে বিশ্বাস করে, যে আহূত প্রেতাত্মা স্বপ্নরূপে দেখা দিবে এবং শীকারের স্থান বলিয়া দিবে। সময়ে সময়ে আহার্য্য রন্ধন করিয়া নদীর শুষ্ক গর্ভে অথবা অন্য কোন নিভৃত স্থানে রাখিয়া দেয়, এবং মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলে,—"এসো, এই আহার্য্য গ্রহণ কর! জীবিতকালে যেমন করিতে, এখনও সেইরূপ গ্রাসাচ্ছাদন দাও! যেখানে থাক, এসো—বৃক্ষশিরে, গিরিশঙ্কটে, অরণ্যদুর্গমে, যেখানেই থাক, এসো!" স্থাপিত আহার্য্য বেষ্টন করিয়া নাচিয়া

বেড়ায়, এবং উপরিলিখিত বাক্যগুলি গান করে; সে গান,—অর্দ্ধেক গান, অর্দ্ধেক চীৎকার।*

প্রেতাত্মার অস্তিত্বে এবং আমাদিগের সহিত তাহার সম্বন্ধে বিশ্বাস, এবং প্রেতাত্মাকে প্রসন্ন করিবার ইচ্ছা, শিক্ষিত এবং সভ্য সমাজেও দৃষ্ট হয়,—দৃষ্টান্ত চীন, দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ। এই বিশ্বাস, এই ইচ্ছার জন্যই আমরা শ্রাদ্ধ করি, তর্পণ করি,—মৃতব্যক্তি মৃত্যুকালে যদি কোন সামগ্রী খাইবার অভিলাস প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই জিনিষ প্রতি সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধাহে যত্নে আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণ সেবায় নিয়োগ করি—ব্রাহ্মণ খাইলেই সকলের খাওয়া হইল। যে সকল সমাজ পৃথিবীতলে অতি সভ্য, অতি উন্নত বলিয়া খ্যাত, সেখানেও এই ইচ্ছার অস্তিত্ব, যার চক্ষু আছে সে দেখিতে পায়। মৃত ব্যক্তিকে সবস্ত্র—স্থল বিশেষে, সশস্ত্র এবং সসজ্জ-সমাধিনিহিত করিবার অর্থ কি? সমাধির উপরে পুষ্পবর্ষণ প্রথার অর্থ কি? মৃত পিতা বা মাতার, পতি বা পত্নীর মৃত্যু সময়ের অভিলাষ পূর্ণ করিতে, বাক্যপালন করিতে, অনুরোধ রক্ষা করিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়,—ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার ভিতরে কোন রহস্য নাই কি?

এই সকল দেখিয়া প্রতীতি হয় যে, প্রেতসন্তোষের ইচ্ছা জগদ্ব্যাপী। তবে কি না, সভ্য এবং সুশিক্ষিতের হৃদয়ে এই ইচ্ছার অবস্থান তত পরিস্ফুট, তেমন স্পষ্টোচ্চারিত নহে—প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, অন্তঃসলিলা প্রবাহিত। অসভ্যের সবই পরিব্যক্ত, সবই উন্মুক্ত, আপনা আপনি চক্ষের উপর আসিয়া পড়ে,—এস্থলেও তাই। সভ্যের সবই আচ্ছাদিত, সবই লুকায়িত, খুঁজি খুঁজি করিয়া দেখিতে হয়—এখানেও তাই। প্রভেদ এই, নতুবা আছে সর্ব্বত্রই।

---

* Bailey, Trans, Eth, Soc, London, N. S. II. P 301 Quoted by Horbert Spencer.

পশুপূজার উৎপত্তি নিরূপণ সম্বন্ধে এইটী আমাদের প্রথম প্রতিজ্ঞা—প্রেতসন্তোষের ইচ্ছা, যে আকারেই হউক সর্ব্বত্র বিদ্যমান; সভ্য সমাজে এই স্রোতঃ অতি ক্ষীণ প্রবাহে প্রবাহিত, অসভ্য সমাজে কূলপ্লাবী, তরঙ্গময় এবং বেগবান। প্রতিজ্ঞাটী বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেকে বলেন, এই আদিম বেগবান ইচ্ছা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল্ এক স্থলে লিখিয়াছেন—"যেখানেই দেখা যায়, লোকে দেহবিমুক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সেই খানেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, লোকে বিশ্বাস করে, যে দেহবিমুক্ত আত্মা সময়ে সময়ে প্রেতাকারে মনুষ্যলোকে দেখা দিতে আসে। প্রত্যুত ইহাই সম্ভব, যে দ্বিতীয় বিশ্বাস হইতেই প্রথম বিশ্বাসের উৎপত্তি। প্রেতাত্মা মনুষ্যলোকে দেখা দেয়, এ বিশ্বাস যদি তাহাদের না থাকিত, তাহা হইলে দেহধ্বংসে আত্মার ধ্বংস হয় না, এরূপ বিশ্বাস কখন আদিম অসভ্যদিগের মনে স্থান পাইত না।* অধ্যাপক হকস্‌লীও এক স্থলে এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং হর্বর্ট স্পেন্সর তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন।†

অতএব বুঝা গেল, যে প্রেত সন্তোষের ইচ্ছা মনুষ্য সমাজ মাত্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বুঝা গেল, যে অসভ্য সমাজের ত কথাই নাই, অতিসভ্য সমাজেও এই স্রোত বিদ্যমান—তবে কি না, সভ্য সমাজে ইহা ক্ষীণপ্রবাহ এবং অন্তঃসলিলা। বুঝা গেল, যে অনেক সমাজিক আচার ব্যবহারের ইহা ছাড়া অন্য মূল নাই—শ্রাদ্ধ এই জন্য, তর্পণ এই জন্য, গয়া এই জন্য, ইহারই জন্য স্মরণচিহ্নের সমাদর, ইহারই জন্য সমাধির উপর পুষ্প বর্ষণ, ইহারই জন্য মৃত আত্মীয়ের মৃত্যু সময়ের অনুরোধ রক্ষা। এই প্রেতসন্তোষেচ্ছা হইতে কি রূপে পশুপূজা উৎপন্ন হয়, সেই রহস্য একবার বুঝিয়া দেখা যাউক।

* Mill's Three Essays on Religion P. 206.

† The Fortnightly Review. 1870.

জাতি মাত্রেরই এক একটা অনন্য-সাধারণ জাতীয় প্রকৃতি থাকে। যে কোন জাতিই হউক, সেই জাতির অন্তর্গত অধিকাংশ লোক প্রায় সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত পার্থক্য অবশ্যই থাকে, কিন্তু তবু এক ছাঁচে ঢালা বলিয়া বেশ বুঝা যায়। ইংরেজ এক জাতি, বাঙ্গালি অন্য জাতি—ইংরেজ এবং বাঙ্গালির প্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। ইংরেজ সাহসী, কার্য্যতৎপর, স্বদেশবৎসল, অসামাজিক এবং স্বার্থপর। বাঙ্গালি ভীরু, দীর্ঘসূত্রী, আলস্যবৎসল, সমাজিক এবং অনেকটা স্বার্থান্ধ। যে জাতির যে প্রকৃতি, তজ্জাতীয় কোন ব্যক্তি তদ্বিপরীত বা অন্য রূপ প্রকৃতির লোক হইলে, লোকের চক্ষু স্বতঃই তাহার উপর পড়ে। বাঙ্গালির মধ্যে যদি কাহারও ব্যাঘ্র শীকার করিবার সাহস থাকিতে দেখা যায়, অমনি সে ব্যক্তি লোকের কথাবার্ত্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে, তাহাকে লইয়া সমাজ মধ্যে একটা আন্দোলন পড়িয়া যায়—সংবাদ পত্রের সংবাদদাতার পাল লিখিবার একটা বিষয় পাইয়া দিন কতক মহা গণ্ডগোল করিয়া লয়। সকলেই বলে, লোকটি বড় সাহসী।

কিন্তু 'সাহসী' শব্দটি সম্বন্ধনিরপেক্ষ সংজ্ঞা। অসভ্য জাতিদিগের শিশু ভাষায় এরূপ সংজ্ঞা বড় বিরল—কোথাও একেবারেই নাই। ভাষা কতকটা পরিপক্ক না হইলে, কতকটা পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হইলে, এ সকল আধারনিরপেক্ষ সংজ্ঞা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। কাজেই যে সকল স্থলে সভ্য জাতিরা এই সকল সংজ্ঞা ব্যবহার করেন, অসভ্যেরা তেমন স্থলে উপমার আশ্রয় গ্রহণ করে - 'গোলাকার' বলিতে হইলে তাহারা বলিবে 'চাঁদের মতন'; 'কঠিন' বলিতে হইলে, বলিবে 'প্রস্তরের মতন'— আমরা যেখানে 'ধূর্ত্ত' বলি, তাহারা সেখানে বলে 'শৃগালের ন্যায়'; আমরা যেখানে 'সাহসী' শব্দ ব্যবহার করি, তাহারা সেখানে বলে 'সিংহের মতন'। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যে এরূপ হইয়া থাকে, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যায়। তাস-

মানীয়দিগের সম্বন্ধে মিলিগান সাহেব লিখিয়াছেন “আধার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া কোন বিষয়ের চিন্তা করিবার ক্ষমতা ইহাদের অতি সংকীর্ণ; সম্বন্ধনিরপেক্ষ ভাবাদির পরিচায়ক শব্দ ইহাদের ভাষায় নাই—কঠিন, কোমল, উষ্ণ, শীতল, দীর্ঘ, ক্ষুদ্র, এ সকলের প্রতিরূপ শব্দ তাহারা জানে না। অষ্ট্রেলিয়ানদিগের মধ্যে প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষের এক একটি নাম আছে, কিন্তু ‘বৃক্ষ’ শব্দ নাই।

অসভ্য সমাজে এই নিয়মানুসারে সচরাচর নামকরণ হয়। কোন গুণ বা দোষ, অভ্যাস বা সংস্কার, শারীরিক গঠন বা সংসারিক কার্য্য, যে কোন কারণেই হউক, ব্যক্তিবিশেষের উপর লোকের দৃষ্টি পড়িলেই তাহারা তাহাকে একটা উপমালব্ধ উপাধি দেয়। সেই উপাধি হয় কোন গুণ বা দোষবাচক, নয় কোন কার্য্য বা শারীরিক গঠনের পরিচায়ক, অথবা কোন সুপরিচিত পদার্থ বা জীবের সহিত সাদৃশ্যব্যঞ্জক। যখন পারিবারিক উপাধির সৃষ্টি হয় নাই, তখন এই রূপ রূপকাত্মক উপাধিদান অবশ্যম্ভাবী। কত সহজে এই রূপ উপাধিদান অসভ্য সমাজে হইয়া থাকে, তাহা সভ্য সমাজের গতিপর্য্যবেক্ষণ করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্রত্যেক সভ্য সমাজেই সামাজিকদিগের আপন আপন নাম ছাড়াও এক একটী পারিবারিক উপাধি আছে, সুতরাং সভ্য সমাজে উপমালব্ধ উপাধি প্রদানের কোনই আবশ্যক নাই, কেননা ব্যক্তিনির্দ্দেশের গোল হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কোন একটী স্থানে পাঁচ জন রাধাকান্ত থাকিতে পারে, সত্য; কিন্তু কেহ রাধাকান্ত দাস, কেহ রাধাকান্ত বসু, কেহ রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কেহ রাধাকান্ত সেন—সুতরাং ব্যক্তিনির্ব্বাচনের কোনই অসুবিধা নাই। যদিই বা এক নাম এক উপাধিধারী একাধিক ব্যক্তি এক স্থানে থাকিল, তাহা হইলেও হয় ত ব্যবসায়সূত্রে ব্যক্তিনির্দ্দেশের অসুবিধা থাকে না। এক পাড়ায় একাধিক রাধাকান্ত সেন থাকিতে পারে, কিন্তু এক জন হয় ত

রাধাকান্ত সেন কবিরাজ, অন্য জন রাধাকান্ত সেন উকীল—সুতরাং ব্যক্তিনির্ব্বাচনের বিশেষ অসুবিধা নাই। ব্যক্তিবিশেষের গুণ বা দোষ নির্দ্দেশ করিতে হইলেও সভ্য জাতির ভাষায় তত্তৎ গুণ বা দোষবাচক বিশেষণ পদের অভাব নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সভ্য সমাজে রূপকাত্মক নামের কোনই প্রয়োজন নাই, তবু সেই আদিম প্রণালীর নাম করণ এখনও সভ্য সমাজে প্রচলিত। বিদ্যালয়ের বালকদিগের মধ্যে দেখিবে—যে বালক কলহের সময় দন্ত বা নখ ব্যবহার করে, তাহাকে তাহারা 'কুকুর' উপাধি প্রদান করে; যাহার মস্তকের কেশ অতিকুঞ্চিত, তাহাকে "গাড়ল" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে; যে স্থূলকায়, তাহার নাম "হাতিরাম"। সংবাদপত্রের "প্রেরিত" লেখকদিগের মধ্যে অনেকে আপনা হইতেই এই রূপ উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক, ঈগল্, চোয়ান, রোহিৎ, শফরী, এই সকল পরিগৃহীত নাম সংবাদপত্রের প্রেরিতস্তম্ভে সচরাচর দেখা যায়। হর্বট স্পেন্সর লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডের যে সকল স্থানে গজাল প্রস্তুত হয়, তথায় উপনাম বহুপ্রচলিত—পারিবারিক নাম কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত ভদ্র লোকেরাও অনেক সময়ে এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিতান্ত নিরীহ ভালমানুষ, তাহাকে আমরা 'মনসা' উপাধি প্রদান করিয়া থাকি। যে ব্যক্তির কথাবার্ত্তা বা ব্যবহার কর্ক্কশ, ইংরেজেরা তাহাকে ভল্লূক বলিয়া থাকেন। কার্লাইলের হাতে পড়িয়া ষ্টার্লিং সাহেব 'ঘূর্ণা বায়ু' উপাধি লাভ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের বাটীর অতি নিকটে নিম্ন শ্রেণীর দুই জন লোক ছিল—তন্মধ্যে এক জনের পুত্র কন্যা আজিও জীবিত—দুই জনেরই নাম রামলাল ছিল; ব্যক্তি নির্দ্দেশের জন্য এক জন রামলাল ঢেঁকি, অন্য জন রামলাল চামচিকে হইয়াছিল। তাহারা মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও লোকে তাহাদের নাম করিতে হইলে, ঐ হাস্যজনক নাম ব্যবহার করে।

অথচ সভ্য সমাজে এরূপ নাম গ্রহণ বা প্রদানের কোনই আবশ্যক নাই। আবশ্যক নাই, তবু এতটা বাড়াবাড়ি। তবে অসভ্য সমাজে?—যেখানে গোত্রোপাধি নাই, বিস্তৃত শ্রমবিভাগ নাই; ভাষা আধারনিরক্ষেপ সংজ্ঞাশূন্য, জ্ঞান লোকপরম্পরাগত —অসভ্য সমাজে কেমন সহজে এবং বহুল সংখ্যায় রূপকাত্মক নাম সকল প্রদত্ত ও প্রচলিত হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

অসভ্য সমাজে সচরাচর এই সকল রূপকাত্মক নাম স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা তদবস্থায় এই সকল নামের স্বতঃই এত আধিক্য হইবে, যে তৎসমুদায় মনে রাখা অসাধ্য। যেখানে লিখিবার পদ্ধতি জ্ঞাত নহে, সাধারণতঃ মনুষ্যবিশেষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অথবা তাহার অল্প দিনের মধ্যে মৃত ব্যক্তির উপনামেরও লোপ হইবার সম্ভব। বিশেষতঃ তখন শ্রমবিভাগের অল্পতানিবন্ধন স্ব স্ব অপরিহার্য্য উপস্থিত অভাব পূর্ণ করিতেই এত সময়ের আবশ্যক হয়, যে বিগত বিষয়ে মনোযোগ করিবার প্রায় অবসর থাকে না—বর্ত্তমান লইয়াই লোকে এত ব্যস্ত, যে ভূত ঘটনা লইয়া চিন্তা করিবার তাহাদের সময় হয় না। এই সকল কারণে সাধারণতঃ ঐ সকল রূপকাত্মক নাম লুপ্ত হইবারই কথা।

সাধারণতঃ তাই বটে, কিন্তু যাহারা আপন গুণে সমাজমধ্যে প্রতিপন্ন হইতে বা প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের নাম লুপ্ত না হইবারই কথা। মনে কর, কোন ব্যক্তি আপন সাহস ও বিক্রমের জন্য খ্যাত হইয়া রূপকাত্মক 'সিংহ' উপাধি প্রাপ্ত হইল। মনে কর সেই ব্যক্তি সাহস ও বিক্রমের সহিত জাতীয় যুদ্ধবিগ্রহে উপর্য্যুপরি জয় লাভ করিয়া প্রতিযোগী জাতির ভীতিভাজন এবং আপন সমাজে ক্ষমতাপন্ন, লব্ধ-প্রভুত্ব এবং যশস্বী হইল। এরূপ লোকের নাম কখনই সহজে লোপ হইবে না। তাহার মৃত্যু হইলেও তাহার সহযোগী যোদ্ধারা সেই অসীম বীরত্বলব্ধ বিজয়লক্ষ্মীর কথা সগৌরবে মনে করিয়া রাখিবে - তাহারা 'সিংহের' পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, এ

কথা তাহারা চিরকাল সাহঙ্কারে জপ করিবে। মৃত বীরের পুত্রেরা আপনাদের জন্মগৌরবের কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক বা সহজে কখনই বিস্মৃত হইবে না - তাহারা যে 'সিংহের' পুত্র, এ গৌরবের কথা তাহারা সযত্নে মনে করিয়া রাখিবে, সাহঙ্কারে প্রকাশ করিবে। সেই জাতীয় অপর লোকেও এ কথা সহজে বা শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। 'সিংহের' জীবিত কালে তাহাকে তাহারা ভয় এবং সম্ভ্রম করিয়াছে; সিংহের মৃত্যুর পর হয় ত তাহার পুত্রদিগকেও ভয় এবং সম্ভ্রম করিবার অনেক কারণ দেখিতে পায়—উত্তরাধিকার নিয়মে, বীরের পুত্র বীর হইবারই সম্ভব—সুতরাং সিংহের' পুত্র সিংহ হইয়াছে, এ ধারণার হাত তাহারা এড়াইতে পারে না। এই রূপে সিংহের পৌত্র প্রপৌত্রাদির মধ্যে, এবং যাহাদের উপর তাহারা প্রাধান্য করে তাহাদের মধ্যে সিংহের বংশের কথা ক্রমে প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধমূল হইয়া যায় এক দিকে গৌরব, অন্য দিকে ভয় এবং ভক্তি, এই প্রবাদ জীবন্ত রাখে। আবার অসভ্য সমাজে ইহা অনেক সময়ে দেখা যায়, যে ক্ষমতাবান মহৎ পরিবার ক্রমে ক্ষমতাবান বৃহৎ পরিবার হইয়া উঠে—যাহার ক্ষমতা অধিক, সেই অবশ্য অধিক সংখ্যক ক্ষমতাবান অপত্য সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে—বৃহৎ পরিবার হইতে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইতে বৃহৎ সম্প্রদায়, কালে সেই মূল ক্ষুদ্র পরিবার হয় ত একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়। 'সিংহের' বংশের যদি এই রূপ শ্রীবৃদ্ধি, এইরূপ পরিণাম হয়, তাহা হইলে সেই জাতি 'সিংহ-জাতি' বলিয়া খ্যাত হইবে—সেই জাতীয় সকলেই জানিয়া রাখিবে, যে তাহাদের আদিপুরুষ, সিংহ।

উপনামের এই রূপ উত্তরাধিকার এবং বিস্তার যে ঘটিয়া থাকে, তাহার প্রমাণও দেওয়া যায়। বেট্‌স্‌ সাহেব এক স্থলে এই রূপ লিখিয়াছেন *—"এক দিবস তিন জন লোক সঙ্গে

* Bates' Naturalist on the River Amazon p 376.

করিয়া আমি শীকারে বাহির হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে দুই জন সহোদর ভ্রাতা; এক জনের নাম যোয়াও জাবুতি, অপরের নাম জেফাইরিনো জাবুতি। জাবুতি শব্দের অর্থ, কচ্ছপ—মন্থর গমনের জন্য তাহাদের পিতা এই উপনাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং ক্রমে তাহা পরিবারিক উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল——এ দেশে এরূপ সচরাচর ঘটিয়া থাকে।” এই প্রদেশেই ঈশানা নদীরতীরবাসী জাতিদিগের মধ্যে ওয়ালেস্ সাহেব প্রেত-জাতি, হংসজাতি, নক্ষত্রজাতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ জন্ লবক্ তাঁহার “প্রাগৈতিহাসিক সময়” গ্রন্থের এক-স্থলে লিখিয়াছেন—“অনেক সময়ে পশুদিগের নাম মনুষ্যের উপাধির জন্য গৃহীত হয়। যে মনুষ্য “ভল্লুক” অথবা ‘সিংহ” উপাধি পাইয়াছে, তাহার অনুচর এবং বংশধরেরা ক্রমে উহাকে জাতীয় নাম করিয়া তুলে।” আমাদের দেশে তন্তুবায়-দিগের মধ্যে যে ভেড়া, ভেড়ী, খেঁকি প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়, সে সকলও কি এইরূপে উৎপন্ন ?

কালের স্রোত বহিয়া যায়। ক্রমে লোকে রূপক এবং সত্যের প্রভেদ বিস্মৃত হয় এবং “সিংহ” উপাধিধারী মনুষ্যবিশেষের বংশকে প্রকৃত সিংহের বংশ বলিয়া বিশ্বাস করে। অসভ্যাবস্থায় এরূপ বিস্মৃতি, এরূপ ভ্রম হইবারই কথা। অন্য এক শ্রেণীর রূপক সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলর এক স্থলে লিখিয়াছেন, “এই সকল রূপক নামে পরিণত হইয়া পারিবারিক কথাবার্ত্তায় বংশাবলীর মধ্যে প্রচারিত ও রক্ষিত হয়--তাহার প্রকৃত মর্ম্ম, পিতামহ হয় ত বুঝে, পিতাও হয় ত জানে, কিন্তু পুত্রের কাছে একটু নূতন রকম বলিয়া বোধ হয়, প্রপৌত্র হয় ত বিপরীত বুঝে।” অতএব দেখা যাইতেছে যে, রূপকের প্রকৃত মর্ম্ম বিস্মৃত হওয়া এবং ভুল অর্থ গ্রহণ করা, অসভ্যাবস্থায় কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ ভাষা যখন এরূপ অসম্পূর্ণ, যে তাহাতে আধারনিরপেক্ষ সংজ্ঞা নাই, তখন রূপক এবং সত্যে ভ্রম হইবারই কথা। যে ভাষায়

সম্বন্ধনিরপেক্ষ সংজ্ঞা নাই, সে ভাষায় রূপক এবং সত্যের প্রভেদ, নির্দ্দেশ করিবার উপায়ও নাই—বস্তু এবং বস্তুর নামে যে প্রভেদ তৎজ্ঞাপক ভাব বহন করা সে ভাষায় অসাধ্য। নামকরণ-কার্য্য নির্দ্দেশ করা আরও অসাধ্য। সেই জন্য অসভ্যাবস্থায় লোকে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ সিংহ উপাধিধারী, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ সিংহ, এতদুভয়ের পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া প্রকৃত সিংহকেই আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া স্থির করে। পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র এরূপ ভ্রমে পতিত না হইতে পারে, কিন্তু যেমন যেমন কালের স্রোত বহিয়া যাইবে, এ বিশ্বাস, এ ভ্রম বংশাবলীতে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। যে অবস্থার কথা আমরা বলিতেছি, তদবস্থায় অন্যরূপ হইতে পারে না। তারপর, যখন অসভ্যেরা এরূপ বিশ্বাস করে, যে মৃত পূর্ব্বপুরুষেরা এখনও আকারান্তরে বা লোকান্তরে বিদ্যমান, এবং প্রসন্ন করিতে পারিলে সাহায্য দানে সক্ষম; যখন এই বিশ্বাস হইতে তদনুযায়ী এবং তদুপযোগী ভাব ও কার্য্য,—ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভয়, উপাসনা, পূজা সমুদ্ভূত হইবে, তখন তাহা সিংহ জাতির প্রতিও অবশ্য প্রবর্ত্তিত হইবে—যাহারা আপনাদিগকে সিংহের বংশ বলিয়া জানে, তাহারা সিংহকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা না করিবে কেন? যাহার উপাসনা করিলে ইষ্টসিদ্ধি হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার উপাসনা না করিবে কেন?

এইরূপে পশুপূজার উৎপত্তি। সর্ব্বত্র এবং সকল প্রকার পশু পূজাই এইরূপে উৎপন্ন; কোথাও এ নিয়মের ব্যভিচার নাই, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু সাধারণতঃ পশুপূজা যে এইরূপ মূল হইতে উৎপন্ন, ইহা বলা যায়।

যৌননির্ব্বাচন।

যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া উচিত, যে যৌননির্ব্বাচন কি? কোন বিষয় লইয়া আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে স্থির করা উচিত, বিষয়টা কি? সে জন্যও বটে, আর অন্য কারণেও এ স্থলে বিষয় নির্ণয় আবশ্যক। যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুপরিচিত নহেন, এবং যাঁহারা অল্পপরিচিত, তাঁহাদের কাছে বিষয়টা নূতন;—অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষায় এ বিষয়ে আন্দোলন যদি পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তাহা আমি অবগত নহি। অনেকের কাছে কথাটাও নূতন।

যৌননির্ব্বাচন একটা শক্তি। শক্তি মাত্রেরই পরিচয় কার্য্যের দ্বারা। কোন শক্তিরই কার্য্যনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা সম্ভবে না। আমরা যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য দেখিয়া যৌননির্ব্বাচনের প্রকৃতি বুঝাইব।

সকল জাতীয় জীবের মধ্যেই স্ত্রী এবং পুরুষ, এতদুভয়ের মধ্যে অনেক শারীরিক প্রভেদ দেখা যায়, অনেক মানসিক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই সকল বিভিন্নতা তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

স্ত্রী এবং পুরুষ বলিতে গেলেই কতকটা প্রভেদ আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। সে প্রভেদ না থাকিলে স্ত্রীপুরুষে পার্থক্যও থাকে না। সন্তানোৎপাদনের সঙ্গে যে সকল ইন্দ্রিয়ের, যে সকল শারীরিক গঠনের সাক্ষাৎসম্বন্ধ আছে, স্ত্রীপুরুষে তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। এই গুলিকে নৈসর্গিক অথবা মুখ্য যৌনচিহ্ন বলা যায়।

অনেক জীবের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আর এক প্রকার পার্থক্য দেখা যায়। অপত্যোৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ পার্থক্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই, সুতরাং এ সকল স্ত্রীপুরুষ পার্থক্যেরই ফল নহে। কোন কোন জাতীয় জীবের মধ্যে চলৎশক্তির উপায়ীভূত অনেক শারী-

রিক গঠন পুরুষে দেখা যায়, তাহা সেই জাতীয় স্ত্রীতে নাই। পুরুষে ধৃত-রক্ষার্থ কতকগুলি গঠন আছে, স্ত্রীতে নাই। সন্তান-রক্ষার, সন্তান প্রতিপালনের উপযোগী শারীরিক গঠন অনেক জাতীয় স্ত্রীর আছে, পুরুষের নাই—যেমন, মানবীর স্তন ইত্যাদি। এ সকল পার্থক্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। স্ত্রীকে পাইলে ধরিয়া রাখিবার জন্য অনেক স্থলে পুরুষের উপায় আবশ্যক হইয়া পড়ে। ডাক্তার ওয়ালেস বলেন, এমন কীট আছে, যাহাদের পুরুষের পদ কোন কারণে ভগ্ন হইয়া গেলে আর তাহারা স্ত্রীসংসর্গ করিতে পারে না। এমন অনেক সামুদ্রিক জীব আছে, যাহাদের পুরুষের পদ সকল প্রাপ্তযৌবনে অসামান্য পুষ্টিলাভ করে। এস্থলে অনুমান করা যায় যে, এই সকল জীব নিয়ত সাগরোর্ম্মি দ্বারা ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়, সুতরাং স্ত্রীকে আপন আয়ত্তে ধরিয়া রাখিবার উপায় না থাকিলে অপত্যোৎপাদন প্রক্রিয়া অসম্ভব অথবা দুর্ঘট হইয়া উঠে। কাজেই ইহাদের পদ সকলের দৈর্ঘ্য এবং পুষ্টির অভাবে তজ্জাতীয় জীবপ্রবাহের রক্ষা অসম্ভব। সুতরাং এস্থলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য বলিতে হইবে।

আর কতকগুলি পার্থক্য আছে, সেগুলি যৌননির্ব্বাচনের ফল—অর্থাৎ সেই অঙ্গ, সেই ইন্দ্রিয় ছিল বলিয়া স্ত্রীলাভচেষ্টায় একজন পুরুষ অপরের অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছে—সেই অঙ্গ, সেই ইন্দ্রিয় ছিল না বলিয়া একজন পুরুষ অপরের ন্যায় স্ত্রীলাভ করিতে পারে নাই। একটি স্ত্রী আছে;—তোমাতে এবং অপর এক ব্যক্তিতে সেই স্ত্রীলাভ লইয়া প্রতিযোগিতা। মনে কর সেই স্ত্রী সুকণ্ঠ-সংগীতানুরাগিণী। এখন, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল কি দাঁড়াইবে? তোমাদের দুই জনের মধ্যে যিনি সুকণ্ঠ, অথবা যাহার কণ্ঠধ্বনি সেই স্ত্রীর কর্ণে সু, সেই অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে। তুমি যদি সুকণ্ঠ না হও, তোমাকে মনোদুঃখে, ম্লানমুখে, মাথা ভাঙ্গা বুকে ফিরয়া যাইতে হইবে। যদি সেই জাতীয় জীবের সকল স্ত্রীই সংগীতানুরাগিণী, সুকণ্ঠপক্ষপাতিনী হয়, তাহা হইলে অবশ্য

এই ফল দাঁড়াইবে যে, যাহারা সুকণ্ঠ নহে তাহাদের অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ হইবে না, সুতরাং তাহাদের বংশলোপ হইবে। যাহারা সুকণ্ঠ তাহারাই কেবল স্ত্রীলাভ করিবে—কেবল তাহাদেরই বংশ থাকিবে।

এই স্থলে আর একটী কথা বুঝাইতে হইতেছে। উত্তরাধিকার নিয়মের কথা সকলে শুনিয়া থাকুন বা না থাকুন, গাল্টনের 'প্রতিভার উত্তরাধিকার' গ্রন্থ সকলে পড়িয়া থাকুন বা না থাকুন, পিতৃপ্রকৃতি যে অনেকটা পুত্রে বর্ত্তে তাহা সকলেই জানেন—অন্ততঃ এতৎসত্যমূলক প্রচলিত প্রবাদটা সকলেই শুনিয়াছেন। প্রবাদটা সত্য। এতৎসম্বন্ধে বহু প্রমাণ সংগৃহীত এবং সমালোচিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অবতারণার এ উপযুক্ত স্থান নহে বলিয়া আমরা প্রমাণ প্রয়োগে বিরত হইলাম। তবে দুই চারিটা মোটামুটি কথা বলিয়া দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

ইঁহা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ রুচি, বুদ্ধিমত্তা, সাহস, বিশেষ বিশেষ পরিবারের সকলের মধ্যেই দেখা যায়। প্রতিভার ন্যায় জটিল শক্তিরও উত্তরাধিকার হয়। এবিষয়ে গাল্টন সাহেব বহু যুক্তি দিয়াছেন, বহুতর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—তন্মধ্যে পিতা পুত্র হর্শেল, পিতা পুত্র মিল, পিতা পুত্র ফক্স, পিতা পুত্র পিটের কথা সকলেই জানেন। প্রুসিয়ার বিখ্যাত 'গ্রেণেডিয়ার' সৈন্যদলের কথাও সকলে জানেন। যে সকল গ্রামে এই দীর্ঘকায় পুরুষ এবং তাহাদের দীর্ঘকায় স্ত্রীগণ বাস করিত, সে সকল গ্রামে বহুতর দীর্ঘকায় লোকের জন্ম হইত। ডারুইন সাহেব এবিষয়ের বিস্তৃত সমালোচন করিয়াছেন।*

এই নিয়মানুসারে সুকণ্ঠদিগের বংশধরেরা সুকণ্ঠ হইল। এবং অনুশীলনে সেই ক্ষমতা আরও পরিপুষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যেও আবার ঐরূপ নির্ব্বাচন হইল,—সেই সুকণ্ঠদিগের মধ্যে যাহাদিগের কণ্ঠ অধিকতর সু, তাহাদেরই বংশ থাকিল, অন্যের

---

* The variation of Animals and plants under domestication vol ii, chap xii.

থাকিল না, কেন না তাহাদের দগ্ধ অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ হইল না। এইরূপে সেই জাতীয় জীবের মধ্যে ক্রমশঃ কণ্ঠমাধুর্য্যগুণের পুষ্টি হইতে লাগিল। ইহারই নাম যৌন নির্ব্বাচন।

কিন্তু সকল জাতীয় জীবেরই স্ত্রী কিছু কণ্ঠরবে মোহিতা হয় না—সকলেরই প্রেমপ্রলোভন কিছু শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয় না। কোন জাতীয় স্ত্রী হয় ত সৌন্দর্য্যের অনুরাগিণী—পুরুষের বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। এস্থলে যৌন নির্ব্বাচনে বর্ণের বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্যের চটক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কেহ বা নৃত্যের পক্ষপাতিনী—তজ্জাতীয় পুরুষের নৃত্যক্ষমতা ক্রমে পরিপুষ্ট হইবে। কোন জাতীয় স্ত্রী হয় ত সুগন্ধে মুগ্ধ পুরুষের শরীরনিঃসৃত সৌরভে উন্মত্তা হইয়া আত্মসমর্পণ করে। ইহাদের মধ্যে যৌন নির্ব্বাচন পুরুষের সৌরভবিকীরণক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে।

সকল সময়ে আবার এত সহজে স্ত্রীলাভ ঘটিয়া উঠে না। যখন একজন স্ত্রীর অনেক প্রয়াসী, অথবা অল্পসংখ্যক স্ত্রীর অধিক সংখ্যক প্রেমপ্রার্থী জুটে, তখন মহাকলহ উপস্থিত হয়। তখন কাজেই তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইবে। স্তন্যপায়ী জীবদিগের মধ্যে স্ত্রীলাভ চেষ্টা প্রায়শঃই যুদ্ধে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে এমন কলহ, এমন ঘোরতর যুদ্ধ হয় যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত না গড়াইয়া তাহার অবসান হয় না। শশকের ন্যায় ভীরু এবং শান্তপ্রকৃতি জীবের মধ্যেও স্ত্রীলাভের জন্য বিবাদ করিয়া একজন অপরকে মারিয়া ফেলিতে দেখা গিয়াছে।*

যাহারা দুর্ব্বল তাহারা হয় মরিয়া যায়, নয় রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়। যাহারা বলবান্, তাহারা থাকে, তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং বংশধরেরা পিতৃপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নির্ব্বাচনে পুরুষেরা বলবান হইয়া উঠে। এইরূপ নির্ব্বাচনে স্ত্রীপুরুষে বলের তারতম্য, আকারের তারতম্য, সাহসের তারতম্য, বুদ্ধির তারতম্য।

---

* Zoologist, vol i. p. 211

এইস্থলে একটী সমস্যা উপস্থিত হয়। যে সকল পুরুষেরা অন্য পুরুষকে পরাজিত করে, অথবা স্ত্রীদিগের চক্ষে অধিকতর মনোহর বলিয়া প্রতীত হয়, কিরূপে তাহারা অধিকসংখ্যক বংশধর রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয়, ইহা বুঝা কিছু কঠিন। অধিকতর বংশধর রাখিয়া যাইতে না পারিলে, যে সকল গুণে তাহারা স্ত্রীলাভ ব্যাপারে অন্য পুরুষ অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্, তাহা কখনই যৌন-নির্ব্বাচনের দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে পারে না। যদি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সংখ্যার তারতম্য বড় না থাকে, এবং যদি পুরুষেরা বহুবিবাহ-পরায়ণ না হয়, তাহা হইলে, কি ভাল কি মন্দ, সকল পুরুষেই অবশ্য অগ্রপশ্চাৎ স্ত্রীলাভ করিবে। যাহারা বলবান, অথবা সুন্দর, অথবা সুগায়ক, তাহারা না হয় অগ্রেই স্ত্রীলাভ করিবে—যাহারা সেরূপ নহে, তাহাদিগকে না হয় দুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে—স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা সমান হইলে কেহই একেবারে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু দুদিন অগ্রপশ্চাতে বড় আসে যায় না। সৌন্দর্য্য অথবা সুকণ্ঠ অথবা সুনৃত্যের সঙ্গে জীবনোপায়াহরণের সম্বন্ধ অল্প, সুতরাং ভাল মন্দ, সুন্দর কুৎসিত, সুকণ্ঠ কুকণ্ঠ, সুনর্ত্তক কুনর্ত্তক সকলেই—যে অগ্রে স্ত্রীলাভ করিবে সেও যেমন, যাহার মেওয়া সবুরে ফলিবে সেও তেমনি—সমানসংখ্যক অপত্য রাখিয়া যাইতে পারে। স্ত্রীপুরুষে সংখ্যার তারতম্য তাদৃশ থাকিলে, স্ত্রীসংখ্যা অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক হইলে অবশ্য অনুমান করা যাইত, যে স্ত্রীগণ উত্তম পুরুষদিগের মধ্যে বিলি হইয়া গেল, সুতরাং অধমেরা পাইল না, কিন্তু তেমন ন্যূনাধিক্য সর্ব্বত্র দেখা যায় না।* বহুবিবাহও সকল জাতীয় জীবের মধ্যে প্রচলিত

* ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্ত্রীপুরুষ সংখ্যার ন্যূনাধিক্য নির্ণয় করিবার জন্য যে সকল তালিকা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য—এত অল্প যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা যায় না। ইহার উপর আর এক শঙ্কট এই যে, যৌননির্ব্বাচনের পক্ষে কেবল মাত্র জন্মকালের ন্যূনাধিক্য স্থির

নাই।+ তবে কেমন করিয়া উত্তমেরা অধিকতর অপত্য সংরক্ষণ করিতে পারিল? কেমন করিয়া এই সকল স্ত্রীমোহন গুণের পুষ্টিসাধন যৌন নির্ব্বাচনের দ্বারা হইল?

করিলে চলিবে না- পরিণত বয়সে কিরূপ দাঁড়ায় তাহাই দেখিতে হইবে। এবং ইহা স্থির করা এক্ষণে এক রূপ অসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। ইহা নিশ্চয়, যে মনুষ্য মধ্যে প্রসবকালে, তৎপূর্ব্বে এবং শৈশবে বালিকার অপেক্ষা বালকের অধিক মৃত্যু হয়। মেষ এবং সম্ভবতঃ আরও কোন কোন শ্রেণীর জীবের মধ্যেও ঐ রূপ। কতকগুলি জীবের পুরুষেরা যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করে। কতকগুলি পরস্পরকে তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায় এবং ক্রমে শীর্ণকায় হইয়া পড়ে। যখন তাহারা ব্যগ্রতা সহকারে ইতস্ততঃ সঙ্গিনী খুঁজিয়া বেড়ায়, সে সময়েও অনেক বিপদ ঘটে। কতকগুলি মৎস্যের পুরুষেরা স্ত্রীগণ অপেক্ষা অনেক ছোট; তাহারা স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক অথবা অন্য মৎস্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। আবার অন্যদিকে, স্ত্রীগণ যখন কুলায় বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, তখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা কোন কোন স্থলে পরিণতদেহ স্ত্রীগণ পুরুষের ন্যায় লঘুগতি নহে; সুতরাং ভাল আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এই সকল কারণে বন্য জীবের মধ্যে পরিণত বয়সে স্ত্রীপুরুষের ন্যূনাধিক্য স্থির করা দুঃসাধ্য। তবে ইহা এক প্রকার জানা আছে যে, কোন কোন স্তন্যপায়ী জীবের, কতকগুলি পক্ষীর এবং কোন কোন শ্রেণীর মৎস্যেরা এবং কীটের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক বটে। কিন্তু সর্ব্বত্র এ রূপ নহে। *Vide Darwin's Descent of Man Part II. chap VIII. supplement*

+ অনেকগুলি স্তন্যপায়ী জীব এবং কতকগুলি পক্ষী বহুবিবাহ পরায়ণ; কিন্তু নিম্নতর জীবশ্রেণীতে এ প্রবৃত্তির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ডারুইন সাহেব এ সমস্যা এই রূপে পূর্ণ করিয়াছেন। মনে কর, কোন প্রদেশস্থ বিশেষ এক জাতীয় বিহঙ্গীসমূহকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম—এক ভাগে, যাহারা অধিকতর সবলকায়; অন্য ভাগে, যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকায়। এক্ষণে ইহা এক রূপ নিঃসন্দেহ যে, যাহারা অধিকতর সবলকায় তাহারা বসন্তকালে অন্য দলের অগ্রেই অবশ্য গর্ভধারণে সক্ষম হইবে—জেনর উয়ের সাহেবের ন্যায় এক জন বিখ্যাত পক্ষিচরিত্রবিৎও এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ বিষয়েও সন্দেহ অল্প যে, যাহারা সবলকায় এবং অগ্রে গর্ভধারণের উপযুক্তা, তাহারা অধিকসংখ্যক বলবান্ অপত্য সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হইবে। বসন্তাগমে পুরুষেরা স্ত্রীদিগের অগ্রেই যৌনসম্বন্ধলোলুপ হয়; যাহারা বলবান, তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগকে তাড়াইয়া দেয়। তাড়াইয়া দিয়া, সবলকায় স্ত্রীদিগের সঙ্গ লাভ করে, কেন না দুর্ব্বলকায় স্ত্রীরা তথনও পুরুষসংসর্গে প্রস্তুত নহে। এই সকল বিজয়ী পুরুষ এবং সবলকায় স্ত্রী অবশ্য অধিকসংখ্যক বলবান্ অপত্য সংরক্ষণ করিবে। পরাজিত পুরুষেরা দুর্ব্বলকায় স্ত্রীসাহচর্য্য করে, সুতরাং তত অপত্য সংরক্ষণ করিতে পারে না। এই রূপ নির্ব্বাচন বহুকাল ধরিয়া হইয়া যায় —বৎসর যায়, শতাব্দী যায়, সহস্রাব্দী যায়, যুগ যায়, কল্প যায় —কালে সেই জাতীয় পুরুষদিগের শারীরিক আয়তন, শক্তি, সাহস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আরও একটা কথা আছে। যুদ্ধে জয়লাভ হইলেই যে স্ত্রীলাভ হয়, এমন নহে। বিজয়ী বীর যদি সেই স্ত্রীর মনের মত না হয়, তাহা হইলে প্রত্যাখ্যাত হয়। পশুপক্ষীর মধ্যেও স্ত্রীলোকের মন পুরুষে সহজে পায় না—অনেক উপাসনা করিতে হয়। বিহঙ্গীগণ, কেহ রূপের ভিখারিণী, কেহ সংগীতপাগলিনী, কেহ নৃত্যোন্মাদিনী, সুতরাং যুদ্ধজয়ীর অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ ঘটিতেও পারে, না ঘটিতেও পারে। ডাক্তার কোভালেভস্কি বলেন যে, কোথাও কোথাও এরূপও দেখা যায়, যে পুরুষেরা ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে, স্ত্রী হয় ত সেই

অবসরে কোন যুদ্ধভীরু নবীন যুবার সঙ্গে সরিয়া পড়িল। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীগণ শক্তির পক্ষে একেবারে অন্ধ নহে—যেমন রূপ চায়, নৃত্যগীত চায়, তেমনি সামর্থ্যও চায়। জেনর উয়ের সাহেব বলেন যে, যে সকল পক্ষীর মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী, তাহাদের মধ্যেও পুরুষ আহত হইলে অথবা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে স্ত্রীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং অধিকতর পরিণতদেহ স্ত্রীগণ—যাহারা প্রথম বসন্তে যৌনসাহচর্য্যোৎসুক হয়—অনেক পুরুষের মধ্য হইতে মনোমত সঙ্গী বাছিয়া লইতে পায়; এবং যদিও তাহারা কেবল মাত্র শক্তি দেখিয়া আত্মসমর্পণ না করুক, যাহাদিগকে তাহারা আত্মসমর্পণ করে, তাহারা নারীহৃদয়জিৎ অন্যান্য গুণের সঙ্গে সবলতা এবং সামর্থ্যেরও অধিকারী। পিতা মাতা উভয়েই সবলদেহ হওয়ায় অপত্যসংরক্ষণ উত্তম হয় —অন্যের অপেক্ষা ভাল হয়। কালের স্রোতঃ বহিয়া যায়; পুরুষেরা ক্রমে অধিকতর বলবান্, অধিকতর যুদ্ধশীল, অধিকতর সুন্দর, অধিকতর মনোহর হইয়া উঠে।

এই স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য দ্বিবিধ। এক প্রকার কার্য্যে পুরুষেরা কলহ বিবাদ করে, দুর্ব্বলেরা পলাইয়া যায়, সবলেরা স্ত্রীলাভ করে। ইহাতে স্ত্রীগণ কোন প্রকার বাছনি করে না—তাহারা নির্ব্বাচনচেষ্টাশূন্য—জোর যার, স্ত্রী তার। দ্বিতীয় প্রকার কার্য্যে, পুরুষেরা স্ত্রীলাভ করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, কিন্তু স্ত্রীগণও চেষ্টাশূন্য নহে—তাহারা আপন মনের মত পুরুষকে আত্মসমর্পণ করে।

প্রায়শঃই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেই যৌননির্ব্বাচনের দ্বারা অধিকতর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, অধিকাংশ জীবের মধ্যেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণের সঙ্গে শাবকদিগের অধিকতর সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহার কারণ এই যে, প্রায় সকল জাতীয় জীবের মধ্যেই স্ত্রীদিগের অপেক্ষা পুরুষের আগ্রহ অধিক। অধিকতর ব্যগ্র বলিয়া পুরুষেরাই পরস্পর যুদ্ধ

করে, আপনাদের বর্ণবৈচিত্র্য লইয়া স্ত্রীদিগের সম্মুখে ঘটা করে, স্ত্রীগণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য উন্মুক্তকণ্ঠে স্বরলহরী বিস্তার করে। যাহারা জয়লাভ করে, তাহারা সিদ্ধমনোরথ হয় এবং তাহাদের বংশধরেরা এই সকল গুণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেনই যে প্রায় সর্ব্বত্র পুরুষেরাই অধিকতর ব্যগ্র, ইহা বুঝা সুকঠিন। তবে ইহা বুঝা যায় যে, স্ত্রী অনুসরণে কৃতকার্য্য হওয়ার পক্ষে ব্যগ্রতা প্রয়োজনীয়; এবং যাহাদের ব্যগ্রতা অধিক তাহাদের অপত্য সংখ্যাও অধিক হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রায়শঃই পুরুষেরা স্ত্রীদিগের অনুসরণ এবং অন্বেষণ করে, এবং তজ্জন্য যৌননির্ব্বাচনের দ্বারা পুংপ্রকৃতিরই অধিকতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এরূপও দেখা যায় যে, স্ত্রীগণই সমধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে— সামর্থ্য, শারীরিক বৃহত্ত্ব, কলহপ্রবণতা, বর্ণবৈচিত্র্য উপার্জ্জন করিয়াছে। কোন কোন জাতীয় পক্ষীদিগের মধ্যে দেখা যায়, যৌন-সাহচর্য্য সংস্থাপন প্রক্রিয়ায় স্ত্রীগণই অধিকতর ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে—পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত ধীর। কুক্কুট জাতীয় কোন কোন বিহঙ্গী এইরূপে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর বর্ণৌজ্জ্বল্য এবং অলঙ্কারাধিক্য লাভ করিয়াছে—অধিকতর বলশালিনী এবং কলহরতা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পুরুষেরা মুখচোরা, স্ত্রীলোকেরা গায়ে পড়া—সাহচর্য্য করিতে এত ব্যগ্র যে গুণাগুণের অপেক্ষা করে না। এ স্থলে প্রতীয়মান হইতেছে, যে যৌননির্ব্বাচনের স্রোতঃ উজান বহিয়াছে।

উজান হউক ভাটা হউক, এ উভয়বিধ প্রক্রিয়াতেই যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য এক তরফা। কিন্তু কোন কোনস্থলে যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য দুই তরফাও হইয়াছে। পুরুষেরাও বাছনি করিয়াছে, স্ত্রীলোকেরাও বাছনি করিয়াছে—"বিনা গুণ পরখিয়া" কেহই মজে নাই—স্ত্রীগণ যেমন মনোহর পুরুষকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, পুরুষেরাও তেমনি মনোহারিণী স্ত্রী দেখিয়া অনুগত হইয়াছে। এ রূপ

স্থলে বাহ্য দৃশ্যে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য বড় লক্ষিত হইবে না, কেননা যাহা পুরুষের চক্ষে সুন্দর তাহাই যদি স্ত্রীর চক্ষে সুন্দর হয়, তাহা হইলে উভয়েতেই সেই সৌন্দর্য্যের পুষ্টি হইবে। তবে যদি স্ত্রীপুরুষে সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী রুচি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য থাকিতে পারে। কিন্তু মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জীবের স্ত্রীপুরুষে রুচির স্বাতন্ত্র্য সম্ভবপর নহে।

কিন্তু যে কোন স্থলে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনচিহ্ন সকলের পরিপুষ্টি উপলক্ষিত হইবে, সেই স্থলেই যে বুঝিতে হইবে, উভয় পক্ষ হইতেই সমসাময়িক বাছনি হইয়াছে, এমন কিছু কথা নহে। বরং তাহা না হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা, কেননা প্রায় সর্ব্ব প্রকার জীবের মধ্যেই পুরুষেরা এত ব্যগ্র যে, প্রায় বাছাবাছি করে না—স্ত্রী হইলেই হইল, যাহাকে পায় তাহারই সাহচর্য্য করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই যৌনচিহ্নের পরিপুষ্টি অন্য কারণেও ঘটিয়া থাকিতে পারে। এমন হইতে পারে যে, পুরুষে প্রথম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সেই পরিবর্ত্তন পুত্র কন্যা উভয়ের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, কোন কারণ বশতঃ বহুকাল ব্যাপিয়া তজ্জাতীয় জীবের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে; এবং পরে হয় ত আবার অন্য কোন কারণে তেমনি বহুকাল ধরিয়া স্ত্রীসংখ্যার আধিক্য ঘটিয়াছে। এরূপ হইলে সহজেই বুঝা যায়, যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ হইতে বাছনি হইয়াছে এবং স্ত্রী পুরুষ অত্যন্ত বিভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ণবৈচিত্র্য প্রভৃতি যে সকল চিহ্নকে আমরা যৌনচিহ্ন বলি, সে সকল যে সর্ব্বত্রই যৌননির্ব্বাচনের ফল, অন্য প্রকারে ঘটিতে পারে না, এ কথাও বলা যায় না। কোন কোন জীবের মধ্যে অসামান্য বর্ণবৈচিত্র্য এবং বর্ণৌজ্জ্বল্য দেখা যায়, অথচ তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করিলে, তাহাদের মধ্যে যৌন নির্ব্বাচনের অস্তিত্ব সম্ভবে না।

এরূপ অনেক সামুদ্রিক জীব * আছে, যাহাদের বর্ণ অসামান্য উজ্জ্বল, কিন্তু তাহাদের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে ইহাকে যৌননির্ব্বাচনের ফল বলিয়া গণ্য করা যায় না, কেন না তাহাদের কতকগুলির মধ্যে স্ত্রীপুং উভয় প্রকৃতিই একই ব্যক্তিতে সংস্থিত, কতকগুলি স্থানৈকসংবদ্ধ এবং চলৎশক্তিবিরহিত, এবং সকলেরই মানসিক স্ফূর্ত্তি অতিসামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং ইহাদের বর্ণৌজ্জ্বল্য কখনই যৌননির্ব্বাচনের ফল নহে।

এ সকল স্থলে হয় ত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বর্ণৌজ্জ্বল্য উপার্জ্জিত হইয়াছে;—হয় ত জীবনসংগ্রামে বর্ণদীপ্তি তাহাদের রক্ষার উপায়ীভূত—হয় ত এতদ্দ্বারা তাহারা শত্রুর লক্ষ্য অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যে অনেক গুণ উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণও দেওয়া যায়। ওয়ালেশ † সাহেব বলেন, যে "গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, যেখানে অরণ্যানী কখনই পত্রবিরহিত হয় না, যেখানে বৃক্ষ সকল চিরশ্যামশোভায় পরিশোভিত, সেখানে বহুসংখ্যক শ্রেণীর পক্ষী দেখা যায়, যাহাদের একমাত্র বর্ণ, শ্যাম।" সুতরাং যখন তাহারা বৃক্ষে থাকে, তখন তাহাদের শ্যামবর্ণ পাদপের শ্যামলতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে—শত্রুকর্তৃক তাহারা সহজে দৃষ্ট হয় না। বৃক্ষাশ্রয়ী পক্ষিগণের শ্যামবর্ণ বোধ হয় এই প্রকারে লব্ধ। আবার যে সকল পক্ষী ভূম্যাশ্রয়ী, তাহারা মৃত্তিকার বর্ণ প্রাপ্ত হয়—যেমন চাতক প্রভৃতি। ‡ ট্রিসট্রাম সাহেব বলেন যে, সাহারা মরুভূমের অধিকাংশ অধিবাসী জীব জন্তুর বর্ণ বালুকার

* For instance, many corals and sea anemones (Actiniae), some jelly-fisn (Medusae, porpita &c), some Planeriae, many star-fishes Ascidians &c.

† West Minister Review July 1867. P. 5.

‡ Partridge, snipe, wood-cock, certain plovers. larks, nightjars &c.

ন্যায়। কোথাও কোথাও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং যৌননির্ব্বাচন উভয়ের কার্য্য একত্র দেখা যায়। সাহারা প্রদেশে এরূপ কতকগুলি পক্ষী আছে, যাহাদের মস্তক এবং গাত্র বালুকার ন্যায় বর্ণপ্রাপ্ত, কিন্তু পাখার নিম্নভাগ অপূর্ব্ববর্ণে রঞ্জিত। পক্ষ বিস্তার করিয়া যখন তাহারা দেখায়, তখনই তাহাদের বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায়—যাহাকে দেখায় সেই দেখে—নতুবা দেখা যায় না। এস্থলে ইহাই অনুমেয়, যে তাহাদের মস্তকের এবং গাত্রের বর্ণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনলব্ধ এবং পক্ষনিম্নভাগ যৌননির্ব্বাচনে রঞ্জিত।

অনেকেই বলিবেন যে, বৃক্ষাশ্রয়ীর শ্যামবর্ণ, ভূম্যাশ্রয়ীর মৃদ্বর্ণ, মরুভূমবাসীদিগের বালুকাবর্ণ যেন সংরক্ষণের উপায়ীভূত বলিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা সিদ্ধ হইল, কিন্তু বর্ণের ঔজ্জ্বল্য অথবা বৈচিত্র্য কিরূপে সংরক্ষণের উপায় হইতে পারে? যাহার বর্ণ উজ্জ্বল, সে বরং শত্রুকর্তৃক আরও সহজে উপলক্ষিত হইবে। সুতরাং লোহিত অথবা তদ্রূপ নয়নাকর্ষক কোন বর্ণ কখনই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সিদ্ধ নহে; অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব, যাহাদের মধ্যে যৌননির্ব্বাচনের সম্ভাবনা নাই, অতি সমুজ্জ্বল বর্ণোপেত। ইহাদের বর্ণদীপ্তি কিরূপে, কোথা হইতে আসিল?

ইহার ত্রিবিধ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। প্রথম,—হাকেল বলেন যে, কেবল জেলি-মৎস্য বলিয়া নহে, অনেক ভাসমান মলস্কা, ক্রুসটেসিয়ান এবং ক্ষুদ্র সামুদ্রিক মৎস্য এইরূপ অতি প্রোজ্জ্বল বর্ণশোভিত। অতএব এমন হইতে পারে যে, এই সকলের সাহচর্য্যে উহারা বাঁচিয়া যায়। উজ্জ্বলবর্ণ জীবের নিকটে থাকায় ইহাদের ঔজ্জ্বল্য রক্ষার উপায়স্বরূপ হইতে পারে—সহজে এক হইতে অন্যকে চিনিয়া লওয়া যায় না। দ্বিতীয়,—অনেকস্থলে উজ্জ্বল বর্ণ আস্বাদকটুতার পরিচায়ক—যাহাদের শরীরের বর্ণ দীপ্তিমান্, তাহারা অখাদ্য। অতএব এমনও হইতে পারে যে, এই সকল জীবের বর্ণ সমুজ্জ্বল বলিয়া ইহারা শত্রু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। এ উভয় ব্যাখ্যাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অনুকূল। তৃতীয়,—হয় ত ইহাদের বর্ণৌজ্জ্বল্য ইহাদের

শারীরিক গঠনের ফল—লাভালাভের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ডারুইন সাহেব এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। তিনি বলেন যে, লাভ না থাকিলেও শারীরিক অংশবিশেষের রাসায়নিক প্রকৃতির অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ বর্ণৌজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। মনে কর, মনুষ্যদেহের শোণিতের ন্যায় সুন্দর বর্ণ বোধ হয় কিছুরই নাই; কিন্তু শোণিতের বর্ণ লইয়া কোন লাভই নাই—শরীরের রক্ত শ্বেত অথবা পীত হইলেও বোধ হয় কিছু ক্ষতি হইত না। হয় ত কোন নবেল প্রিয় পাঠক বলিয়া বসিবেন—রক্তের লৌহিত্যে কোন লাভ নাই কে বলিল?—ইহাতে সুন্দরীর গণ্ডের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। তা বটে; স্বীকার করি, শোণিতের লৌহিত্য সুন্দরীর সুন্দর গণ্ড সুন্দরতর করে; স্বীকার করি, তাহা দেখিয়া উষ্ণ-শোণিত যুবার হৃদয়শোণিত আলোড়িত হয়; কিন্তু সুন্দরীর গণ্ড সুন্দর করিবার জন্যই শোণিত লোহিত বর্ণ পাইয়াছে, এ কথা বোধ হয় কেহই বলিবে না। এতটা বাড়াবাড়ি করিতে বোধ হয় কাহারও সাহস হইবে না।

এতক্ষণ পাঠক অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, কোন্ কোন্ স্থলে বর্ণ-বৈচিত্র্য যৌননির্ব্বাচনের ফল,, কোথায় বা অন্য কারণ সমুদ্ভূত, ইহা স্থির করা অতি সুকঠিন ব্যাপার। তবে সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে সকল জীবের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে বর্ণের তারতম্য আছে—স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ অথবা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বর্ণ অধিকতর বিচিত্র—অথচ ইহাদের জীবনপ্রণালীতে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যে তদ্দ্বারা এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা হইতে পারে, সে স্থলে বর্ণ-বৈচিত্র্য যৌননির্ব্বাচনের ফল বুঝিতে হইবে। ইহার উপর যদি স্ত্রীকে পুরুষের কাছে অথবা পুরুষকে স্ত্রীর কাছে এই সৌন্দর্য্য লইয়া ঘটা করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে আর সন্দেহ থাকে না—তখন নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, এ বর্ণ-বৈচিত্র্য যৌননির্ব্বাচনেরই ফল!

এতক্ষণ আমরা যে সকল কথা লইয়া আন্দোলন করিলাম,

তাহাতে বোধ হয় এক প্রকার বুঝা গেল, যৌননির্ব্বাচন কি—ইহার কার্য্য কিরূপ ইহার ফল কিরূপ? এক্ষণে যৌননির্ব্বাচনে এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে একবার তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যৌননির্ব্বাচনের প্রকৃতি আরও পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে। যদি এ উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে এ তুলনার অবতারণা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্যপ্রণালী যেমন কঠোর, যৌননির্ব্বাচনের তেমন নহে। জীবন এবং মৃত্যু লইয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ব্যবসায়। যৌননির্ব্বাচনের কার্য্যেও কোথাও কোথাও মৃত্যু সংঘটিত হয়—সময়ে সময়ে পুরুষদিগের মধ্যে স্ত্রী লইয়া এমন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, যে এক জন না মরিলে আর তাহার অবসান হয় না। কিন্তু প্রায়ই এতদূর গড়ায় না। অধিকাংশ স্থলেই এই পর্য্যন্ত হয় যে, পরাজিত পুরুষে হয় ত স্ত্রীলাভ করিতে পারে না— হয় ত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পুরুষ, স্ত্রী বিলম্বে প্রাপ্ত হয়—তজ্জাতীয় জীব যদি বহুবিবাহপরায়ণ হয়, তাহা হইলে হয় ত অল্পসংখ্যক স্ত্রী প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা অধিকসংখ্যক এবং বলবান্ অপত্য রাখিয়া যাইতে পারে না--হয় ত অপত্যই রাখিয়া যাইতে পারে না।

অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকিলে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের সীমা আছে। একটা দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বৃক্ষাশ্রয়ী পক্ষিগণ শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হয়। সে শ্যামবর্ণের সীমা আছে—বৃক্ষপত্রের যে শ্যামবর্ণ, সেই শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হইলেই বর্ণ পরিবর্ত্তনের সীমা হইয়া গেল, কেন না তদপেক্ষা গভীরতর শ্যামবর্ণ রক্ষার উপায় না হইয়া বরং ধ্বংসের কারণ হইবে—শত্রুগণ সহজে চিনিতে পারিবে, শরীরের শ্যাম আর বৃক্ষশ্যামে ঢাকিবে না। যৌননির্ব্বাচন-সম্পাদিত পরিবর্ত্তনের এরূপ সীমা নাই—ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে, সুতরাং নির্ব্বাচন প্রক্রিয়া সমান চলিবে। তবে, কোন গুণ কতদূর পুষ্ট হইবে, তাহা অবশ্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের

দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। তত্তৎ গুণের সমধিক পুষ্টি যদি ক্ষতিজনক এবং বিপদসঙ্কুল হয়, তাহা হইলে যাহাতে ক্ষতি হইতে পারে, অবশ্য তত পুষ্ট হইবে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে এতদ্বৈপরীত্যও দেখা যায়, অর্থাৎ যৌননির্ব্বাচনে অঙ্গবিশেষের এরূপ পরিণতি হয় যে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিজনক। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন কোন শ্রেণীর মৃগের শৃঙ্গপরিণতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের শৃঙ্গ এত বড় হইয়া উঠিয়াছে, যে তদ্দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা—শত্রুহস্ত হইতে পলায়নের অন্তরায় হইয়া উঠে। মনুষ্যদেহের লোমহানি ইহার অন্যতর দৃষ্টান্ত। শীতপ্রধান দেশের ত কথাই নাই, গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও লোমহানি ক্ষতিজনক, কেননা ইহাতে শরীরে অধিকতর সূর্য্যোত্তাপ লাগে। অথচ যৌননির্ব্বাচনে এই ক্ষতিজনক পরিণতি ঘটিয়াছে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয় অথবা স্ত্রীচিত্তাকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া পুরুষের যে লাভ, অবস্থার উপযোগিতা নিবন্ধন লাভের অপেক্ষা তাহা অধিক।

বঙ্গে ধর্ম্মভাব।

আজ কাল আমাদের দেশে নাস্তিকতার কিছু প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কৃতবিদ্যমণ্ডলীমধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে একেবারে উদাসীন নহেন, তাঁহারা প্রায় নাস্তিক। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা প্রায় পণ্ডিতদিগের অনুসরণ করেন। এই কারণে, যাহারা কৃতবিদ্য নহে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে দেখাদেখি উদাসীন অথবা আস্থাশূন্য।

যাঁহাদের কিছু মাত্র লেখা পড়া বোধ আছে, তাঁহারা সকলেই প্রায় হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য; কেবল লোকলজ্জা ভয়ে, সমাজচ্যুত হইবার আশঙ্কায়, অহঙ্কার এবং আত্মাদরের খাতিরে মৌখিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম কলহের উপযুক্ত নহে * বলিয়াই আমরা উহার বন্ধু। হিন্দুধর্ম্ম দুর্ব্বল,

---

* শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' ইত্যভিধেয় পুস্তকের বিশমোল্লায় গলৎ আছে। তিনি যে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ঠিক হিন্দুধর্ম্ম নহে। হিন্দুধর্ম্ম যে কি, তাহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের যে কোন স্থলে যে কোন মত পাওয়া যায়, তাহাই হিন্দুধর্ম্মের অংশ। এবং সংস্কৃতের বিশাল সাহিত্যে নাই হেন কথা নাই, নাই হেন মত নাই। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম কি, তাহা বলা দায়। রাজনারায়ণ বাবু যে সকল মত লইয়া বচার করিয়াছেন, ঠিক তাহার বিপরীত মতও হিন্দুধর্ম্মের অংশ বলিয়া পরিগৃহীত। রাজনারায়ণ বাবু যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহা হিন্দুধর্ম্মরূপ মহাসাগরের একটা ঢেউ মাত্র। এখনকার হিন্দুসমাজ যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে, তাহাতে সে ঢেউয়ের নাম গন্ধও নাই!

জরাজীর্ণ, নিরাশ্রয় বলিয়াই আমরা উহার সহায়। আর ব্রাহ্মেরা উহার শত্রু, অশুভাকাঙ্ক্ষী, উচ্ছেদাভিলাষী, এজন্যও অনেকে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ—যুক্তি দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম সমর্থন করিতে প্রস্তুত। নতুবা, শ্রদ্ধা বা আস্থা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আপনার সুখের, স্বার্থের, বা আমোদের প্রতিকূল হইলে, প্রায় কাহাকেও হিন্দুধর্ম্মের মুখ রাখিতে দেখা যায় না। হিন্দুধর্ম্মানু-যায়ী কর্ম্মকাণ্ডও কতক কতক শিক্ষিত দলের আছে, কিন্তু সে অন্য কারণে। তাঁহারা দেবদেবীকে প্রকাশ্যে প্রণাম করেন, কতকটা উদাসীন ভাবে, কতকটা পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ, কতকটা হয় ত লোকের চক্ষে ধূলা দিবার অভিপ্রায়ে। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব করেন, কতকটা পিতামাতার খাতিরে, কতকটা বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে, কতকটা আমোদের জন্য, আর কতকটা—ঠিক বলা যায় না, কিন্তু বোধ হয় যেন শ্রীচরণ-কমল-যুগলের ভয়ে। কেহ না মনে করেন, হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা হইতেছে। হিন্দুধর্ম্ম ভাল কি মন্দ, শ্রদ্ধার উপযুক্ত কি না, সে কথা আমরা বলিতেছি না; সমাজমধ্যে ধর্ম্মভাবের কিরূপ অবস্থা, তাহাই নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থা আরও শোচনীয়। ভক্তি শ্রদ্ধা দূরের কথা, অনেক ভদ্রলোকে ব্রাহ্ম বলাইতে লজ্জা বোধ করেন, ব্রাহ্ম বলিলে অপমান বোধ করেন। অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মে এতই যে কি লজ্জা বা অপমানের কথা আছে, তাহাও বুঝা যায় না। সে যাহাই হউক, লজ্জা থাক বা না থাক, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর লোকের আস্থা নাই। যাঁহারা নাম লেখাইয়া কুলত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র,—তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ আবার গোময় খাইয়া সমাজে ফিরিয়াছেন, দেখা গিয়াছে;—কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাজকর্ত্তৃক সমাদৃত নহে। অশিক্ষিত লোকে পূর্ব্বাবধিই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী, এক্ষণে আবার কৃতবিদ্যেরাও ইহার প্রতিকূলে। দুই চারি দশ জন কৃতবিদ্যের আস্থা থাকিতে পারে, কিন্তু দুই চারি জনের কথা ধর্ত্তব্য নহে। আর নূতন করিয়া ব্রাহ্ম হইতেও প্রায় দেখা যায়

না। ব্রাহ্মধর্ম্মের দিন কাল গিয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহারা প্রকাশ্য নাম লেখান, রেজেষ্টরি করা ব্রাহ্ম, তাঁহাদের মধ্যেও সকলে আস্থাবান নহে। অনেকে ব্রাহ্ম, কেবল লঘু গুরু ভেদ উঠাইবার জন্য, কেবল ছত্রিশ জাতি লইয়া কুক্কুটমাংসের মহোৎসব করিবার জন্য, কেবল পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিলোপ করিবার জন্য। সমাজে যাতায়াত করেন, কেহ আমোদ দেখিতে, কেহ গান শুনিতে, কেহ সময় কর্ত্তন করিতে, কেহ লোকের চক্ষে ধূলা দিতে, কেহ প্রধান আচার্য্যের মন রাখিতে। এস্থলেও বলিতেছি, কেহ না মনে করেন, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিন্দা করিতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পাইল না, তাহার কতকগুলি কারণ দেখা যায়। এক ত ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশীয় ধর্ম্ম—বঙ্গ দেশেই ইহার উৎপত্তি। থিওডোর পার্কার ইহার সেণ্ট পল বটেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্ম হইয়াছে। যেখানে যে ধর্ম্মের উৎপত্তি, সেখানে সে ধর্ম্ম প্রায় প্রবল হয় না। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল নাই; থাকিলেও দৃঢ় নহে। হিন্দুর বেদ আছে, খৃষ্টীয়ানের বাইবেল আছে, মুসলমানের কোরাণ আছে, পারসিকের জেন্দ আবেস্তা আছে—ব্রাহ্মের কি আছে? তিনি কিসের দোহাই দিতে পারেন? তাঁহার দোহাই দিবার জিনিষ দুটি—প্রকৃতিএবং সহজ জ্ঞান। কিন্তু তিনি যেরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তেমন ঈশ্বরের কথা প্রকৃতি কিছু বলে না। সহজজ্ঞানও এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে না। যদি পারিত, তাহা হইলে ঈশ্বর লইয়া এত মতভেদ হইত না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে দেশে স্থান পাইল না, তাহার আর একটা কারণ বোধ হয় আমাদের আত্মাদর। পরের শিষ্য হইতে গেলেই আপনাকে একটু ছোট হইতে হয়। যদি কাহারও অনুসরণ করিতেই হয়, তবে না হয় স্পেন্সর, কোমৎ, মিলের অনুসরণ করিব। নতুবা যার তার মতে ডিটো দিয়া, যাকে তাকে গুরু স্বীকার করিব কেন? এইরূপ নানা কারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবল হইতে পারিল না। তাহার সকল গুলি নির্দ্দেশ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই হয় কঠোর নাস্তিক, নয় কঠোরতর উদাসীন। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহাদের দোহাই দিয়া ইহাঁরা নাস্তিক, তাঁহারা কেহই ঠিক নাস্তিক নহেন। ঈশ্বর নাই, এমন কথা কেহই বলেন না। মিল ঈশ্বর স্বীকার করেন। বাইবেলের সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর স্বীকার করেন না বটে, স্রষ্টা স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু নির্ম্মাতা স্বীকার করেন। জগতের নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবার সেই নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াই নির্ম্মাতার শক্তির সীমাবদ্ধতা সংস্থাপন করিয়াছেন, কেননা কৌশলাবলম্বন শক্তির অভাবের পরিচায়ক। সে যেমনই হউক, মিল নাস্তিক নহেন। ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে যদিও নির্ম্মাণ—কৌশল তর্কের খণ্ডন হইয়া গিয়াছে, তবু ডারুইন নাস্তিক নহেন। তিনি স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন। স্পেন্সরও নাস্তিক নহেন। প্রচলিত ধর্ম্ম সকল যে ভ্রমাত্মক, তাহা তিনি বলেন বটে, কিন্তু এই সকল ভ্রান্ত ধর্ম্মের মূলে যে সত্য আছে, ইহা তাঁহার দৃঢ় চিশ্বাস। তাঁহার ঈশ্বর—বিশ্বব্যাপী অজ্ঞেয় শক্তি। বৈজ্ঞানিকেরা এত দিন আলোক, তাপ, তাড়িত প্রভৃতি দ্বারা বিশ্বকার্য্যের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, কিন্তু অধুনাতন সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, যে এ সকলও চরম শক্তি নহে—বিশ্বব্যাপী এক মহান্ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। এই বিশ্বব্যাপী শক্তিকে স্পেন্সর ঈশ্বর বলেন। কোমৎ আস্তিক নহেন বটে, কিন্তু নাস্তিকও নহেন। ঈশ্বর নাই, এমন কথা তিনি বলেন না। তিনি বলেন, জগতের ঘটনা পরম্পরা দেখ, এবং এই ঘটনা পরম্পরা যে নিয়মে বদ্ধ, তাহাদের অনুসন্ধান কর। এতদতিরিক্ত আর কিছু আছে কি না, তাহা জানিবার আমাদের অধিকার নাই—তাহা অজ্ঞেয়—সুতরাং তাহার অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র। নাস্তিক হওয়া দূরের কথা, বরং নাস্তিকদিগকে তিনি মতিভ্রান্ত এবং অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তবে ইহাঁরা নাস্তিক হইলেন কেন? কিন্তু ইহাঁরাও উত্তর দিতে

পারেন,--নাস্তিক না হইবই বা কেন ? তোমার স্পেন্‌সর, কোমৎ, মিল্ কিছু বেদ নহেন, যে শ্রীমুখ দিয়া যাহা বাহির হইবে তাহাই অভ্রান্ত। তাঁহারা এক এক জন মহা পণ্ডিত বটেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অনেক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহারা যাহা কিছু বলিবেন তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে, যতটুকু বলিবেন, ঠিক তত টুকুই বিশ্বাস করিতে হইবে এমনই বা কি শাস্ত্র আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাইতে চাও, তাহার প্রমাণ দাও—কেবল ইহার উহার নামে কে বিশ্বাস করিবে ? প্রমাণ কিছু আছে কি ?

এ কথার সচরাচর এই রূপ উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে ; ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে নাস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং ঈশ্বর নাই, এ দুইটি প্রতিজ্ঞায় অনেক প্রভেদ। যাহা কিছুরই অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তাহাই নাই, এ কথা বলা যায় না। আর, ঈশ্বর যে নাই তাহারই বা প্রমাণ কি ?

নাস্তিকেরা সহজে নিরস্ত হইবার লোক নহেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নাই, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এ দুইটা এক কথা নহে বটে, কিন্তু সচরাচর কি রূপ করিয়া থাকেন ? ইহাই সচরাচর দেখা যায়, যে যতক্ষণ কোন বিষয়ের প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাহার নাস্তিত্বেই লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। চতুর্ভুজ মনুষ্য যে নাই, তাহার কিছুই প্রমাণ দিতে পারেন না, তবে তাহা নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন কেন ? কেবল এই কারণে, যে তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। যদি তাহাই হইল, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেই বা অন্য প্রণালী অবলম্বন করিব কেন ? ঈশ্বর নাই, এ কথারও কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু প্রমাণ চাহিবারও কাহারও অধিকার নাই। আমরা প্রমাণ দিতে বাধ্য নহি। যিনি অস্তিত্ব পক্ষ অবলম্বন করিবেন, প্রমাণের ভার তাঁহারই উপর থাকা উচিত এবং যুক্তিসঙ্গত। সে প্রমাণ যতক্ষণ দিতে

না পারিবেন, ততক্ষণ আমরা মানিব না, মানিতে বলিতেও পারেন না।

এ বিবাদের মীমাংসা করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই—সাধ্যও নাই। যাহা বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ, উভয় জগতের কারণ, উভয় জগতের আধার, তাহা বাহ্য জগৎ এবং অন্তর্জগৎ হইতে অবশ্য বৃহত্তর, সুতরাং বাহ্যজগৎ তাহাকে কেমন করিয়া পাইবে—অন্তর্জগৎ তাহাকে কেমন করিয়া ধরিবে? যাহার অজ্ঞেয়ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহার উপর বাক্যব্যয় করা এক প্রকার বেকুবি, কেননা বাক্যব্যয় করিলেই তাহার অজ্ঞেয়ত্ব পাকতঃ অস্বীকার করা হয়।

নাস্তিকেরা আরও বলেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে সমাজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্ম্মের একটা অঙ্গ, এবং ধর্ম্মের সম্বন্ধ পরলোকের সঙ্গে, ইহলোকের সঙ্গে নহে। ইহলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ, নীতির। অতএব লোকে ধর্ম্মে আস্থাবান্ হউক বা না হউক, তাহাতে সমাজের কিছু অনিষ্ট নাই।

ঈশ্বরে বিশ্বাসাবিশ্বাসে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমাজের অনিষ্ট নাই, ইহা আমরাও স্বীকার করি। প্রত্যেকের ধর্ম্ম, প্রত্যেকের নিজের কথা। তুমি যদি ঈশ্বর না মান, তাহার ফল তুমিই ভোগ করিবে—অন্যকে করিতে হইবে না। যদি নরকে যাইতে হয়, তুমিই যাইবে, অপর কাহাকেও যাইতে হইবে না। নস্তিকতা সামাজিক পাপ নহে। কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমাজের অনিষ্ট যদিও নাই, গৌণসম্বন্ধে আছে। তাহা আমরা দেখাইতেছি।

সংসারে ইহাই সচরাচর দেখা যায় যে, যখনই আমরা কোন প্রাচীন তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া নূতন তত্ত্ব অবলম্বন করি, তখনই কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যক্ত তত্ত্বের শত্রু হইয়া উঠি। পূর্ব্বে যে ভালবাসিয়াছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তখন অযথা ঘৃণা করি। সহানুভূতিজনিত অনুরাগ, বিরুদ্ধানুভূতিজনিত বিরাগে পরিণত হয়। পূর্ব্বে যাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আদর করিয়াছি,

পরে তাহাকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া অশ্রদ্ধা করি—অমূল্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম, মূল্যহীন বলিয়া ঘৃণায় বর্জ্জন করি—হয় ত প্রকাশ্য অবমাননা করি। এবং এই শত্রুতার বেগ প্রায় পূর্ব্বানুরাগের বেগানুযায়ী হইয়া থাকে। পিউরিটানেরা পূর্ব্বতন ধর্ম্মমন্দির সকলকে ঘোড়া বাঁধিবার আস্তাবল করিতেন। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় লোকে 'মাস' পুস্তকের পাতা ছিঁড়িয়া বন্দুকে দিবার কাগজ করিত, 'চালিসে' করিয়া মদ্যপান করিত, গিরিজার মধ্যে সুরাপানোদ্দীপ্ত হইয়া বেলেল্লাগিরি করিত। কালাপাহাড় ব্রাহ্মণসন্তান এবং হিন্দুধর্ম্মে পরম আস্থাবান ছিলেন। সেই কালাপাহাড় মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া জগন্নাথ দেবকে পোড়াইলেন।

ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, পরিত্যক্ত ধর্ম্মে যদি কিছু সত্য থাকে—থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—তাহাও দেখিতে পাই না, দেখিতে চাহি না—হয় ত মেখিয়াও দেখি না। তাহাতে যদি কিছু ভাল থাকে-থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা তাহারও উপেক্ষা করি হয় ত মন্দ মনে করি। যাহাকে দেখিতে পারি না, তার সব মন্দ।

এই কয়টি কথা মনে রাখিয়া দেখা যাউক, নাস্তিকতায় কোন অনিষ্ট আছে কি না। প্রায় সকল সমাজেই ধর্ম্ম এবং নীতি একত্র-সম্বদ্ধ দেখা যায়; ধর্ম্মনির্লিপ্ত নীতিশাস্ত্র বা নীতিনির্লিপ্ত ধর্ম্ম কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত কারণে, ধর্ম্ম পরিত্যাগের সঙ্গে প্রায়ই নীতিরও অপচয় ঘটে। নীতির অপচয় যে সামাজিক অমঙ্গল, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই।

আর একটা অনিষ্ট এই ঘটে, যে ধর্ম্ম পরিত্যাগের সঙ্গে ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যখনই আমরা ভ্রান্ত বলিয়া পূর্ব্ববিশ্বাস পরিত্যাগ করি, তখনই ভাবিয়া লই যে, এই ভ্রমের সঙ্গে সত্য বা ভাল কিছু নাই —থাকিতে পারে না। ধর্ম্মপরিত্যাগ করি এবং তাহার সঙ্গে

সঙ্গে ধর্ম্মভাবের উপকারিতা পর্য্যন্ত উপেক্ষা করি। বঙ্গের নাস্তিক দলে তাহাই ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। অনেকে ধর্ম্ম-বিশেষের সঙ্গে ধর্ম্মভাবও উড়াইতে চাহেন। অনেকের ভরসা আছে, যে কালে ধর্ম্মভাব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে।

সমাজমধ্যে এরূপ মতের বহুলপ্রচার হইতে দেখিলে আমরা বাস্তবিকই ভীত হই। কোন সমাজ মধ্যে ধর্ম্মভাবের অপচয় হইতে দেখিলে আমাদের মনোমধ্যে সমাজের অনিষ্টাশঙ্কা উপ-স্থিত হয়। ধর্ম্মভাবের কার্য্যকারিতায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমাদের বিশ্বাস নিতান্ত অমূলকও নহে। প্রাকৃতিক পরিণতিবাদের* সাহায্যে ধর্ম্মভাবের কার্য্যকারিতা সংস্থাপন করা যায়। নিম্নতর জীব সকলে ধর্ম্মভাবের অস্তিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কোন চিহ্ন দেখা যায় না। অতএব ইহা স্বীকার্য্য, যে ধর্ম্মভাবটা চৈতন্যের স্বভাবপ্রদত্ত, অবশ্যস্থাতব্য অংশ নহে। জীবের ক্রমপরিণতিতে উহা মানবমানসে আবি-র্ভূত হইয়াছে। অতএব ইহা সিদ্ধ যে, মনুষ্যজীবনের প্রয়ো-জননিচয়ের সঙ্গে ধর্ম্মভাবের উপযোগিতা আছে। সুতরাং উহা মানবের সুখবিধায়িনী, শুভপ্রসূতি এবং কল্যাণদায়িনী।

ধর্ম্মভাবের উপকারিতা অন্য রকমেও দেখা যায়। আজি, এই নাস্তিকতার মধ্যেও, ধর্ম্মভাব অনেক সৎকার্য্যের মূল; অনেক সৎকীর্ত্তির উত্তেজক, অনেক দেশহিতকর ব্যাপারের প্রাণ। আজি, এই বিজ্ঞানপ্রধান, বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এই ধর্ম্মভাব, অনেকের পক্ষে অনেক বিপদে ভরসা, অনেক দুঃখে সান্ত্বনা, অনেক শোকে জুড়াইবার স্থান, অনেক তাপিত হৃদয়ের শান্তিসলিল।

যাঁহারা মনে করেন, কালে ধর্ম্মভাব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে, তাঁহাদিগকে আমরা গুটি দুই কথা বলিতে চাই। কোমৎ বলিয়া

---

* Evolntiou theory.

ছেন বটে, যে কোন বিষয়ের মূলানুসন্ধান করা বৃথা - তাহা মানবের অজ্ঞেয়। কিন্তু বৃথা হউক, অবৃথা হউক, ছাড়ান ত যায় না। অনেক সময় মনের ভিতর হইতে প্রশ্ন হয়—আমি কে?—আমি ছাড়া সংসারে যাহা আছে, তাহা কি?—কোথা হইতে আসিলাম?—কোথা হইতে আসিল? হর্বট স্পেন্‌সর, পরমাণু লইয়া এবং আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী শক্তিদ্বয় লইয়া অপূর্ব্ব জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ডারুইন বৃক্ষের বানর খাড়া করিয়া মনুষ্যজাতির পিতৃনিরূপণ করিয়া দিলেন। কিন্তু গোল ত মিটিল না—এক পদ সরিয়া গেল মাত্র। তার পর, লাপ্লাসের জগতে জীবসঞ্চার ব্যাখ্যা। তিনি অপূর্ব্ব এক চিত্র আঁকিলেন। আমরা মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেই চিত্র দেখিলাম। দেখিলাম—অপার, অনন্ত, নীল সমুদ্র, তাহার গর্ভ, তাহার উপকূল, তথায় কর্দ্দমরাশি—সেই সমুদ্রের উপরে, উপরের নীল সমুদ্রে, তাড়িত প্রবাহ ছুটিতেছে—আর সেই সমুদ্রের গর্ভে, সেই উপকূলের কর্দ্দমরাশির ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জন্মিয়া কিল্‌কিল্‌ করিয়া নড়িয়া উঠিতেছে—এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়া মোহিত হইলাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের জ্ঞান ও সকল কথার উত্তর দিতে অক্ষম। কিন্তু জ্ঞান এবং চিন্তা সমদূরগামী নহে—যাহা জানি না, হয় ত জানিতে পারিও না, তদ্বিষয়ক চিন্তাও মনে আসে। এই জ্ঞানাতীত বিষয়ের চিন্তাই ধর্ম্মভাবের মূলভিত্তি। সুতরাং চিন্তা যত দিন জ্ঞানসীমার অন্তর্বদ্ধ না হয়, তত দিন অন্ততঃ ধর্ম্মভাবের লোপ হইতে পারে না। কিন্তু চিন্তা কোন কালে জ্ঞানসীমার অন্তর্বদ্ধ হইবে কি? ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জ্ঞান বৃদ্ধিশীল—বিজ্ঞানের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিই হইতেছে। ইহাও সকলে স্বীকার করিবেন যে, কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান আবশ্যক। অনুসন্ধেয় বিষয়ের মানসিক অস্তিত্ব—অহম্প্রতীতির অবস্থাবিশেষরূপেস্থিতি—অনুসন্ধানের পূর্ব্বগামী;—যাহার ভাব মনে নাই, তাহার

অনুসন্ধান হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে ইহা আবশ্যক, যে চিন্তা জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিবে। এবং চিন্তা যত দিন জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিবে, তত দিন ধর্ম্মভাবের লোপ আশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে, এমন কথা উঠিতে পারে যে, যখন মনুষ্যের জ্ঞান সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, তখন অবশ্য জ্ঞানাতীত চিন্তা থাকিবে না, কেন না জানিতে আর কিছু বাকি থাকিবে না, সুতরাং ধর্ম্মভাব লুপ্ত হইবে। কিন্তু মনুষ্য-জ্ঞান। কোন কালে সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বদর্শী হইবে কি? স্পেন্‌সর * বলেন—না।

আর এক দল নাস্তিক আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইবে ধর্ম্মভাবও তত দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। এ মতেরও আমরা অনুমোদন করি না। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অব্যভিচারিতায় দৃঢ় আস্থা জন্মাইয়া দেয়। ভূয়োদর্শনে বৈজ্ঞানি-কের মনে জাগতিক ঘটনারাজির অচল সম্বন্ধে, কার্য্যকারণের অচল সাহচর্য্যে, সুফল কুফলের অবশ্যম্ভাবিতায়, অটল আস্থা বদ্ধমূল হইয়া যায়। ভ্রমবুদ্ধিপরবশ হইয়া সাধারণ লোকে, যে পুরস্কার পাইবার, যে শাস্তি এড়াইবার আশা করে, বৈজ্ঞানিক তাহার অনুমোদন করিতে, তাহাতে আস্থা রাখিতে পারেন না বটে, কিন্তু তিনি দেখিতে পান যে, বিশ্বরচনা এমনই চমৎকার, যে পুরস্কার অথবা শাস্তি কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। দেখিতে পান যে, অবাধ্যতার বিষময় ফল অপরিহার্য্য। দেখিতে পান যে, মনুষ্য যে সকল শক্তির অধীন, তাহারা ক্ষেমঙ্কর এবং অব্যভিচারী। দুঃখ যেমন অবাধ্যতার অনিবার্য্য ফল, বাধ্য-তার অবশ্য-প্রাপ্তব্য ফল তেমনি অধিকতর সম্পূর্ণতা, উচ্চতর সুখ। সুতরাং তিনি অবাধ্যতার যার পর নাই বিরোধী। সুতরাং তিনি নিজে বাধ্য এবং অপরকে বাধ্য দেখিতে ইচ্ছা করেন।

* First Principles. The unknowable.

সুতরাং বিজ্ঞান ধর্ম্মভাব প্রসবিনী। অতএব যথার্থ জ্ঞান, প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের বিরোধী হইলেও, ধর্ম্মভাবের বিরোধী নহে—বরং পরিপোষক। স্পেন্‌সরের বিশ্বাস এইরূপ।

মানব-লভ্য জ্ঞানের সীমা আছে। সে সীমা যে মনুষ্যশক্তির অনতিক্রম্য, তাহা জ্ঞানই আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেয়। বুঝাইয়া দেয় যে, এ বিশ্বের চরম কারণ, মূল শক্তি, মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। সুতরাং দেখাইয়া দেয় যে, মনুষ্যশক্তি অতি ক্ষুদ্র। যে মহান্ শক্তি বিশ্বের আধার—প্রকৃতি, জীবন, চিন্তা, যাহার মূর্ত্তিপরম্পরা মাত্র—সে শক্তি যে কেবল মাত্র জ্ঞানের অতীত নহে, ধারণারও অতীত, তাহা জ্ঞানই আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়। নম্রতা, আপনার ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞান, বিশ্ব শক্তির মহত্ত্ব জ্ঞান, এ সকল যদি ধর্ম্মভাবেয় অংশ হয়, তাহা হইলে জ্ঞান অবশ্য ধর্ম্মভাবের পরিপোষক। গল-শিষ্য স্প্রুট্‌জাইম বলেন, ভক্তিই ধর্ম্মভাবের সার। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে যথার্থ জ্ঞানের ন্যায় ধর্ম্মভাবপোষণানুকূল আর কি? কেন না বিশ্বশক্তির মহত্ত্ব—জ্ঞান পরিপুষ্ট করিতে অমন আর কি? অতএব জ্ঞান, ধর্ম্মবিশেষের অথবা প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালী সমূহের বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম-ভাবের প্রতিকূল নহে। যে কোমৎ সর্ব্বধর্ম্মবিরোধী, সেই কোম্‌ৎই আবার নবধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে পরম গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যে ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান গৌরব।

অধ্যাপক হক্সলি এ সম্বন্ধে একস্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন;—"যথার্থ জ্ঞান এবং যথার্থ ধর্ম্ম, যমজা ভগিনী; এক হইতে অপরের পার্থক্য উভয়েরই মৃত্যুর কারণ। জ্ঞান যে পরিমাণে ধর্ম্ম-জীবন, জ্ঞানের সেই পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি; ধর্ম্মও যে পরিমাণে প্রমা-মূলক, ধর্ম্মের সেই পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি। জ্ঞানানুরাগীদিগের মহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল, ততটা তাঁহাদের বুদ্ধির ফল নহে, যতটা সেই বুদ্ধির ধর্ম্মভাব-নির্দ্দেশিত গতির ফল। তাঁহারা যে সকল সাকার

আবিষ্কার, যে সকল তত্ত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, সে সকল, ততটা তাঁহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যনিবন্ধন নহে, যতটা তাঁহাদের সহিষ্ণুতা, তাঁহাদের অনুরাগ, তাঁহাদের একচিত্ততা, তাঁহাদের ত্যাগ স্বীকার নিবন্ধন।”

ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগকে আর একটা কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের শেষ করিব। তাঁহারা সমাজকে ধর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চাহেন, ভালই; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মবন্ধনের পরিবর্ত্তে আর কোন্ কার্য্যের বন্ধন তাঁহারা সংস্থাপিত করিতে পারেন?—ধর্ম্ম ব্যতীত আর কি বন্ধন বাঁধিতে চাহেন? সমাজের জন্য একটা বন্ধন যে আবশ্যক, তাহাতে বোধ হয় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সন্দেহ করিবেন না। আমাদের কার্য্য-মূলা বৃত্তি সকল অন্ধ এবং চিন্তাশূন্য। যখন তাহারা আবেগ-প্রণোদিত হয়, তখন কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে। সমাজের মঙ্গলের জন্য ইহা আবশ্যক যে, এই বৃত্তিনিচয়ের উপর একটা শাসন থাকে। ধর্ম্মশাসনের স্থানে আর কোন্ শাসনকে অভিষিক্ত করা যাইতে পারে, আমরা ভাবিয়া পাই না। সত্য, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে যে, কেহ কেহ ধর্ম্মবন্ধনকে পদদলিত করিয়াও পৃথিবীর প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন—ধর্ম্ম মানেন নাই, অথচ সাধুতায় জগতের দৃষ্টান্ত স্থল, জগতের অনুকরণীয়। কিন্তু সকলেই কিছু কোমৎ* বা লাপ্লাসের ন্যায় লোক নহে। সকলেরই জ্ঞানার্জ্জনৈকচিত্ততা কিছু এত প্রবল নহে, যে অধিকাংশ জীবনী আকর্ষণ করিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তি-নিচয়কে ক্রমে হ্রস্বতেজঃ করিয়া ফেলিতে পারে। সকলেরই মানবহিতপরায়ণতা কিছু এত প্রশস্ত নহে, যে রিপুগণ তাহার

---

* কোম্তের নাম, মাদেম ক্লোতিল্দ্ দে ভোর নামের সঙ্গে যাঁহারা মন্দভাবে জড়াইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা নিন্দুক মনে

তলে ছায়ান্ধকারমজ্জিত হইয়া ক্রমে শুকাইয়া উঠে। সাধারণকে সৎপথে উৎসাহিত করিতেও একটা উত্তেজনা চাই—মনুষ্যমানসের স্বাভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে।

ধর্ম্মশাসন ব্যতীত আর ত্রিবিধ শাসন আমরা কল্পনা করিতে পারি,—বিবেচনা শক্তি, রাজবিধি, এবং সাধারণের মত। ইহাদের কার্য্যকারিতা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথম, বিবেচনা শক্তি। নীতিসূত্রনিচয়ের প্রাকৃতিক মূল অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা কয় জন বুঝে? কার্য্যবিশেষের ফলাফল কয় জন গণনা করিতে পারে? কয় জন গণনা করে? সমাজের অধিকাংশ লোকেরই কার্য্যে বিবেচনার ভাগ অতি অল্প। যত কেন উন্নত, যত কেন সভ্য সমাজ হউক না, লোকের কার্য্য অভিনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে প্রায় ইহাই বোধ হয়, যেন যত দূর পারা যায়, চিন্তা না করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই অধিকাংশ লোকের উদ্দেশ্য। * অতি সামান্য দৈনন্দিন কার্য্য; যাহাতে অতি অল্প বিবেচনা আবশ্যক, তাহাও প্রায় কেহ বিবেচনা করিয়া করে না; অথচ এ সকল কার্য্যে কোন বলবান্ নিকৃষ্ট বৃত্তির উত্তেজনা নাই। যেখানে আছে, সেখানে যে লোকে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? নৈতিক আজ্ঞার ধর্ম্মশাসনে হতবিশ্বাস হইয়া, তাহার প্রাকৃতিক মূল নির্ব্বাচন করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিবে, ইহা কেমনে বিশ্বাস করিব?

নীতিসূত্রের প্রাকৃতিক মূল নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য করিতে পারিবার পূর্ব্বে অনেক কথা বুঝা আবশ্যক। এই কার্য্যের প্রকৃতি ভাল, ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইলে কেবলই তত্তৎ-

---

* Indeed, it almost seems as though most made it their aim to get through life with the least possible expendi-

কার্য্যের অব্যবহিত ফল পর্য্যালোচনা করিলে চলিবে না, গৌণ ফল সকলও দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, ইহাতে নিজের লাভালাভ কি?—অন্যের লাভালাভ কি?—সমাজের লাভালাভ কি? অনেক কার্য্য আছে, আশু অনিষ্ট করে না, কিন্তু পরিণামে সর্ব্বনাশ করে। অনেক কার্য্য আছে, নিজের লাভ হয়, কিন্তু পরের সর্ব্বনাশ হয়। এরূপ অবস্থায় অভ্রান্ত বিচার কয়জন করিতে পারে? এত বিচার করিয়া কে কার্য্য করিতে পারে? এত বিচারই বা কয়জন করিতে পারে? আবার বিপদের উপর বিপদ, যাঁহারা ফলাফল বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই বা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন কৈ? অতি পণ্ডিত, অতি বড় জ্ঞানী, অথচ জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া শত শত অনিষ্টকর কার্য্য করেন; তাহার ফল ভোগ করেন; যতদিন কষ্টভোগের স্মৃতি মনোমধ্যে জাজ্বল্যমান থাকে, ততদিন হয় ত নিবৃত্ত থাকেন; আবার যেমন কালের ছায়ান্ধকার সেই স্মৃতির উপর পড়িয়া তাহাকে অপরিষ্কার করে, অমনি যে-সেই।

আসল কথা, মনুষ্যের কার্য্য, মনুষ্যের বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই বিবেচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না; অনুভূতি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। অতএব বিবেচনাশক্তি ধর্ম্মের সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহে। এ উপযুক্ততা বিবেচনাশক্তির যখন হইবে, সে দিন এখনও আসে নাই, আসিতে বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, রাজবিধি। রাজবিধি যে ধর্ম্মের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না, তাহার একটা কারণ এই যে, রাজবিধি কার্য্যসমুৎপাদিকা শক্তি নহে। রাজবিধির অধিকার নিবৃত্তির দিকে, প্রবৃত্তির দিকে নহে। এই এই কার্য্য করিও না, রাজবিধি কেবল ইহাই বলে,—তাহাও স্পষ্টতঃ বলে না, পাকতঃ বলে। এই কার্য্য কর, এমন কথা রাজবিধি বলে না। পরের কুৎসা করিও না, পরের গায়ে হাত দিও না পরদ্রব্য আত্মসাৎ

কর, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান কর, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দাও, ইহা রাজবিধি বলে না। সুতরাং আমাদের উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের উপর রাজবিধির অধিকার নাই। আবার নিবৃর্ত্তির দিকে যে অধিকার, তাহাও অতি সংকীর্ণ। রাজবিধি বলিলেন,—'দেখ বাপু, অন্ধকার রাত্রে গৃহস্থের মেয়ের ঘরে প্রবেশ করিও না; যদি কর এমন জানিতে পারি, তাহা হইলে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর মেয়াদ দিব।' উত্তর—'যে আজ্ঞা' আপনি যাহাতে না জানিতে পারেন, তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান থাকিব।' রাজবিধির কার্য্যকারিতা মিটিয়া গেল। অতএব রাজবিধিও ধর্ম্মের সিংহাসনে বসিতে পারে না।

তৃতীয়, সাধারণের মত।* মৃত মহাত্মা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, তাঁহার 'ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রস্তাবত্রয়' ইত্যভিধেয় গ্রন্থে এই শাসনের কার্য্যকারিতা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যৌন অসদাচার অবলম্বন করিয়া কথাটা বুঝাইয়াছেন। লিখিয়াছেন যে, ব্যভিচারে যে পাপ, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অবশ্য সমান। কোন ধর্ম্মই এমন শিক্ষা দেয় না যে, স্ত্রীলোক পরপুরুষগামিনী হইলে তাহার অদৃষ্টে চৌষট্টি রৌরব হইবে, আর পুরুষ পরস্ত্রীগামী হইলে তাহার ভাগ্যে অক্ষয় স্বর্গ হইবে। যদি নীরয়ে পচিতে হয়, উভয়কেই হইবে। অথচ ব্যভিচারদোষে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অধিক লিপ্ত; কেন না সাধারণের মত, উভয়ের মধ্যে একটু তারতম্য করে—ব্যভিচারিণীর যে নিন্দা, যে কলঙ্ক, যে লাঞ্ছনা, যে গঞ্জনা, ব্যভিচারীর তত নহে। এস্থলে দেখা যাইতেছে, যে পাপ হইতে বিরত রাখিতে ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা সমাজশাসনের (সাধারণের মত) কার্য্যকারিতা অধিকতর। মনুষ্যকে ধর্ম্মশাসন যে পাপ হইতে যে পরিমানে বিরত রাখিতে পারে না, সমাজশাসন সেই পাপ হইতে সে পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে। অতএব সাধা-

রণ মতের কার্য্যকারিতা ধর্ম্মশাসনের অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরং অধিক।*

মিলের যুক্তিতে গুটি দুই ছিদ্র আছে বলিয়া বোধ হয়। সিদ্ধান্তটি ঠিক করিয়া করা হয় নাই বা ঠিক করিয়া লেখা হয় নাই। মিলের তর্ক হইতে ঠিক সিদ্ধান্ত এইরূপ হয়,—এক দল মনুষ্যকে ধর্ম্মশাসন যে পাপ হইতে যে পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে, আর এক দল মনুষ্যকে সমাজশাসন সেই পাপ হইতে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে। ইহার উপর আমরা এই বলিতে চাই, যে সমান অবস্থায় দুইটি শক্তির কার্য্য দেখিয়া তাহাদের বল তুলনা হইতে পারে বটে, কিন্তু যে স্থলে অবস্থার সমতা নাই, সে স্থলে হইতে পারে না। মিলের যুক্তির দোষ এই যে, অবস্থার সমতা অভাবেও তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ, উভয়েই মনুষ্য বটে, কিন্তু মনুষ্যজাতির অন্তর্গত বলিয়া কি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোন নির্দ্দেশিতব্য প্রভেদ নাই? যদি থাকে, তবে ইহাদের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা কখনই শক্তিদ্বয়ের বলতুলনা হইতে পারে না। মনুষ্যও জীব, বানরও জীব; কিন্তু জীবশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া কি মনুষ্য এবং বানর এতদুভয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন শক্তির কার্য্য দেখিয়া, সেই শক্তিগণের বলের ন্যূনাধিক্য নির্দ্দেশিত হইতে পারে? যদি না হয়, তবে, স্ত্রীলোকও মানুষ পুরুষও মানুষ বলিয়াই বা কেন হইবে? মিলের তর্কের ভ্রান্তি সুস্পষ্টতর করিবার জন্য আমরা ঐরূপ আর একটা যুক্তি লিপিবদ্ধ করিতেছি। গোবর্দ্ধন দাস মনুষ্য; বেতাল পঞ্চবিংশতির রাজমহিষীও মনুষ্য; রাজনন্দিনীর গাত্র চন্দ্রকরস্পর্শে দগ্ধ হইয়াছিল; গোবর্দ্ধন দাস মধ্যাহ্ন সূর্য্যতাপেও ক্লিষ্ট নহে; অতএব সূর্য্যকিরণ অপেক্ষা চন্দ্র কিরণ অধিকতর

---

* J. S. Mill Utility of Religion

তাপযুক্ত। যদি এ যুক্তিতে, এ সিদ্ধান্তে ভুল থাকে, তবে মিলের যুক্তিতে, মিলের সিদ্ধান্তেও আছে।

স্ত্রীপ্রকৃতি এবং পুরুষপ্রকৃতি যে একরূপ নহে, তাহা বুঝাইতে অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন রাখে না। শারীরতত্ত্ববিৎ মাত্রেই জানেন, যাঁহারা শারীরতত্ত্ববিৎ নহেন তাঁহারাও জানেন, যে স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক গঠন একরূপ নহে, সুতরাং মানসিক গঠনও একরূপ হইতে পারে না। অতএব ইহা সিদ্ধ, যে স্ত্রী প্রকৃতি এবং পুংপ্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। মিলের যুক্তির আর একটা দোষ এই যে, যে স্থলেদুই তিনটী শক্তি কার্য্য করিতেছে, মিল সে স্থলে একটী মাত্র ধরিয়া বিচার করিয়াছেন—বাকী গুলিকে একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন, নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। পুরুষে স্ত্রীলোকে যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে সমাজশাসনের কঠোরতা ব্যতীতও স্ত্রীলোকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর জিতেন্দ্রিয়তা ভরসা করা যায়। পুরুষ প্রতিপালক; স্ত্রীলোক প্রতিপালিত। যে প্রতিপালিত, তাহাকে সুতরাং প্রতিপালকের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, প্রতিপালকের বিরাগের ভয় করিতে হয়, প্রতিপালকের মন রাখিয়া চলিতে হয়। যে কার্য্য করিলে প্রতিপালক বিমুখ হইবেন, সে কার্য্য করিতে প্রতিপালিত অল্পে সাহস করে না। অতএব মিলের যুক্তি ভাঙ্গিয়া গেল।

এই গেল মিলের মত সমালোচনা। এক্ষণে একবার মিলকে অব্যাহতি দিয়া, অন্যরূপ বিচারমার্গ অনুসরণ করিয়া, সাধারণ মতের সহিত ধর্ম্মশাসনের তুলনা করিয়া দেখা যাউক।

সাধারণের মতটা বাহ্যশক্তি। তাহার শাসন কেবল কার্য্যের উপর থাকিতে পারে। মনের উপর কোন অধিকার নাই। মনের দুরভিসন্ধি যতক্ষণ না কার্য্যে পরিণত হয়, ততক্ষণ তাহা সাধারণ মতের কার্য্যপথবর্ত্তী নহে। সুতরাং সাধারণের মত, মনঃসংশোধনে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মত কার্যবিশেষের উপর শাসনরূপে প্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ইহা আবশ্যক যে, সেই

কার্য্য সাধারণে জানিতে পারে। সুতরাং যে স্থলে প্রকাশ-সম্ভাবনা নাই, সে স্থলে সাধারণের মত অকর্ম্মণ্য। অতএব দেখা গেল যে, সাধারণ মত মনঃসংশোধন করিতে অক্ষম এবং গোপনের পাপ নিবারণ করিতে অক্ষম। ধর্ম্মভাব আভ্যন্তরীণ শক্তি, সুতরাং তাহার এ কার্য্যকারিতা আছে। মানস সংশোধন করিতে সক্ষম, কেন না উহার কার্য্য মনের উপর। গোপনের পাপ নিবারণ করিতে সক্ষম, কেন না উহার কাছে কোন কার্য্যই গোপন থাকিতে পারে না—মনের অগোচর পাপ নাই। অতএব সাধারণ মতও ধর্ম্মসিংহাসনে বসিবার অনুপযুক্ত।

আমরা যে বিচার করিলাম, তাহাতে বুঝা গেল যে, ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা আছে। সমাজের হিতের জন্য, মানবের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা আছে। পাপহইতে বিরত রাখিতে, সৎপথে উৎসাহিত করিতে, উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের উন্নতিসাধনে, পশুভাবের সংযমনে, ধর্ম্মভাবের আশ্যকতা আছে। ধর্ম্মভাবের অপচয়ে সমাজের অমঙ্গল আছে। কোমৎ অথবা লাপ্লাসের ন্যায় লোক নাস্তিক হইলে সমাজের অনিষ্ট না হইতেওপারে; কিন্তু রাধু বাবু, মাধু বাবু, যাদু বাবু যদি প্রেত-নাটক লিখিতে শিখিয়াই নাস্তিক হয়েন, তাহাতে অনিষ্ট আছে। তাঁহারা যে সমাজের অন্তর্গত, সে সমাজের বড় দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বঙ্গসমাজে এইরূপ লোকের কিছু বাড়াবাড়ি, অতএব বঙ্গসমাজের বড় দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে।

এবিষয়ে অনেক কথা আমাদের বলিতে বাকী থাকিল। এ বিষয়ের পুনরান্দোলন করিবার ইচ্ছাও থাকিল।

ভার্গববিজয়।*

সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ, আমাদের 'আদর্শ' বাঙ্গালি সমালোচক বাবু দ্বিবিধ সমালোচনা শিখিয়া রাখিয়াছেন। যে কোন গ্রন্থ হাতে পড়ুক না কেন, এই দুইয়ের অন্যতর অবলম্বিত হইয়া থাকে। এক প্রকার সমালোচনা এই রূপ,—"এই গ্রন্থ ভাল, খুব ভাল, অতি ভাল; এমন গ্রন্থ হয় না, হইবার নয়।" আর এক প্রকারের সমালোচন—"গ্রন্থ মন্দ, অতি মন্দ, যার পর নাই মন্দ; ইহার ভিতরে কেবল মাথা আর মুণ্ড, ছাই আর ভস্ম।" ফল কথা, ইহা এক প্রকার স্থির, যে যাহাকে ভাল বলিতে হইবে, তাহাকে আকাশে তুলিতে হইবে, যাহাকে মন্দ বলিতে হইবে তাহাকে দুই পায়ে দলিতে হইবে। নিয়ম এই, হয় স্তুতি কর নয় নিন্দা কর—সমালোচনা একেবারেই করিও না।

এ কথার সমর্থনার্থ দৃষ্টান্ত খুঁজিতে অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। এই "ভার্গববিজয়" কাব্যের কতকগুলি সমালোচনা মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাহা পাঠ করিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। যে প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা 'প্যারাডাইস লষ্ট' অথবা "ডিভাইনা কমেডিয়া" সম্বন্ধে করিতে গেলেও একটা কিন্তু রাখিয়া করিতে হয়। এক জন লিখিয়াছেন,—"যে পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছি তাহাতেই বলিতে পারি যে,পুস্তক খানি অতি উৎকৃষ্ট; ইহাতে রস-ভাব-রীতি-গুণ আদি যথাস্থানে যথাসময়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" যে পর্য্যন্ত পড়ি-

---

* ভার্গববিজয় কাব্য। শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৸০ মাত্র।

য়াছেন, তাহাতেই এই, শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে না জানি কি বলিতেন। আমরা নির্লজ্জ হইয়া জিজ্ঞাসা করি, যদি রস, ভাব, রীতি, গুণ, আবার আদি, যথাস্থানে এবং যথাসময়ে সন্নিবেশিত হইল, তবে আর বাকীই থাকিল কি? বাল্মীকি অথবা ব্যাসে, বর্জ্জিল অথবা মিল্টনে, গেটে অথবা শেক্ষপীয়রে, ইহার অধিক আর কিছু আছে কি?

আবার কতকগুলি সংবাদপত্রে এই পুস্তকের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিয়াও আমরা অবাক্ হইয়াছি। সে কেবল খাঁটি নির্জ্জলা নিন্দা। তার সার মর্ম্ম এই যে, গ্রন্থখানি কিছু নহেরও অধম, এবং গ্রন্থকার বাতুল। লিউইস সাহেব তাঁহার 'দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের' একস্থলে লিখিয়াছেন যে, কোম্‌তকে নূতন নূতন মত সকল প্রচার করিতে দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে বাতুল স্থির করিয়াছিল, কিন্তু 'প্রামাণিক দর্শন' যদি বাতুলতার ফল হয়, তাহা হইলে আমাদের কামনা, বাতুলতার এপিডেমিক হউক। এতটা গৌরবের সঙ্গে না হউক, কিন্তু তবু আমরা বলিতে পারি যে, ভার্গববিজয় যদি বাতুলতার ফল হয়, তাহা হইলে আমরা কায়মনোবাক্যে কামনা করি; বাঙ্গালার কাব্যলেখকদিগের পালের মধ্যে বাতুলতার এপিডেমিক হউক। অধিকাংশ বাঙ্গালা কাব্য অপেক্ষা ইহা ভাল।

কিন্তু এ কথায় কিছুই প্রশংসা হইল না। জলধরের অপেক্ষা সুন্দর বলিলে কিছু সৌন্দর্য্যের প্রশংসা হয় না। বিদ্যাদিগ্‌গজ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বলিলে কিছু বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হয় না। অধিকাংশ বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ এত জঘন্য যে, তাহার অপেক্ষা ভাল বলিলে কোনই প্রশংসা হয় না। সেই জন্য একটু বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন।

ভার্গব-বিজয় গ্রন্থের বিষয়সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিবার আবশ্যক রাখে না। কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাসের প্রসাদে, কথক ও গায়কের প্রসাদে, যাত্রাওয়ালা ও নাটকলেখকদিগের দৌরাত্ম্যে,

মহাভারত ও রামায়ণের কথা কিছু কিছু না জানে, এমন লোক বঙ্গদেশে বিরল। রামচন্দ্র কর্তৃক পরশুরামের অভিভব এ গ্রন্থের বিষয়। জিনিস্‌টা কি, সকলেই বুঝিয়াছেন।

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিষয়টা গুরুতর বটে। এ মহদ্ব্যাপারে যাঁহারা লিপ্ত, তাঁহারা সকলেই মহৎ—আকাশের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, বাসুকীর ন্যায় ধীর, হিমালয়ের ন্যায় স্থির। নায়ক সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম—দেবতার ভয় দূর করিতে, পৃথিবীর ভার লঘু করিতে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন। নায়িকা, অযোনিসম্ভবা সীতা—যিনি স্ত্রীবিহিতগুণে রমণীকুলের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। প্রতিনায়ক, ভার্গব পরশুরাম—যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়শোণিতে "সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হ্রদান্।" লোকসমাবেশ অতি উচ্চ অঙ্গের বটে। বিষয় মনোনীত করা নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

খুব ভালও হয় নাই। পরশুরাম বীর, রামচন্দ্র বীর, লক্ষ্মণ বীর, দশরথও বীর, বিশ্বামিত্র ঋষি, বশিষ্ঠ ঋষি, পরশুরামও ঋষি;—এইরূপ এক প্রকারের লোক একত্র কার্য্যক্ষেত্রে আনিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য রক্ষা করা অতি দুরূহ ব্যাপার—সকলে পারে না। আবার ঘটনা এত অল্প, কথা এমন সংক্ষেপ যে, ইহা লইয়া সার্দ্ধ তিন শত পৃষ্ঠারও অধিক একখানি গ্রন্থ লেখা হয় না—অন্ততঃ সকলে পারে না। তবে কি না, কবি আপন কল্পনা-সম্ভূত অনেক নূতন চিত্র দিতে পারেন, অনেক নূতন সৃষ্টি সন্নিবেশিত করিতে পারেন—ইহাও সকলে পারে না। ভার্গববিজয়ের শেষে গোপালবাবু পরিচয় দিয়াছেন যে, তিনি অতি অল্পবয়স্ক—অল্প বয়সে, প্রথম উদ্যমে, এই অগাধ, অপার সাগরে ঝাঁপ দেওয়া ভাল হয় নাই।

এক্ষণে গ্রন্থের পরিচয়। প্রথম সর্গে বড় কিছু নাই—বাজে কথায় পরিপূর্ণ, কাজের কথা দেখিলাম না। তবে শেষকালে

কবি বলিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ খনি হইতে তিনি রত্নসংগ্রহ করিবেন,—

"হে বাল্মীকে, কালিদাস, কীর্ত্তিবাস, মধো,
তোমাদের কোষ হতে হে রাজেন্দ্রগণ;
লইবে——ইত্যাদি।"

কোষগুলি যে বহুরত্নপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সকল কোষ হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া অভিনব কাব্যভূষণ নির্ম্মাণ করিলে কত দূর মহামূল্য হয়, তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে—হয় ত খাটে না—প্রায়ই মিলে না। ভার্গববিজয় হইতেই ইহার প্রমাণ দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় সর্গে ভার্গবের আশ্রম বর্ণনা। হিমাচলের এক নির্ঝরিণী তীরে ভার্গবের আশ্রম বিরাজিত। তথায় দেবদারু তরুব্রজ অম্বর স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইঙ্গুদী, খদির, তীব্রগন্ধ তেজপত্র, লবঙ্গ-বল্লরী, এলালতাবীথি, দারুচিনি, চিত্রিত-বিগ্রহ ভূর্জ্জপত্র, শাল, তাল, তমাল, পিয়াল, যাহা হইতে

মঞ্জুল-মঞ্জরী-রজো-রাশি নভোমার্গ
অনিশ আবরি উড়ে চন্দ্রাতপনিভ;

পীযূষ-পূরিত দ্রাক্ষা, কম সোমলতা, অদূরে শ্যামাভ নীবার ধান্যভূমি,—অশোক, কিংশুক, বকুল, কর্ণিকার প্রভৃতি নানা বৃক্ষে, নানা ফলে, নানা লতায়, নানা ফুলে এই স্থান পরিশোভিত। মলয়ানিল মৃদুল বহিতেছে, পরাগরাশি উড়াইতেছে, লতাপাদপ আন্দোলিতেছে। তথায় কস্তুরী কুরঙ্গ আশ্রমপাদপে গাত্রকণ্ডু নাশ করিতেছে—মৃগমদগন্ধে তপোবনস্থলী আমোদিত করিতেছে। মৃগযূথ অভিনবতম শস্পপ্ররোহতলে বিশ্রাম করিতেছে; শাবকগণ মেষশিশুর সঙ্গে খেলা করিতেছে। দূরস্থ কন্দর-শায়ী সিংহগর্জ্জন শুনিয়া বৃষভ গবয় প্রভৃতি বসুধাতল ক্ষুরাগ্রে বিদীর্ণ করিয়া

সদর্পে নাদিতেছে। অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষচ্ছায়ায় হস্তিযূথ আষাঢ়-দিগন্তব্যাপী নবমেঘের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং

——————করেণুনিবহ
কমল-পরাগ-গন্ধি-সলিল ছড়ায়ে
দিতেছে প্রণয়ে স্বীয় স্বীয় প্রিয়তমে।

মন্দ নহে; কিন্তু এ সুন্দর চিত্রটী কালিদাসের, গোপালবাবুর নহে—কুমারসম্ভব হইতে অনুবাদিত।

এই তপোবনে ভগবান্ ভৃগুকুলপতি তপস্যা করিতেছেন—সারঙ্গ-কীর্ত্তি-আসনে আসীন, বল্কল-পিহিত, আশীর্ষ উন্নত দেহ, অর্দ্ধ নিমীলিত স্থির লোচনযুগলে অপূর্ব্ব দ্যুতি, করযুগ নাভীর উর্দ্ধে বদ্ধ, গলে অক্ষমালা এবং যজ্ঞোপবীত, ললাট ফলকে ঊর্দ্ধ-পৌণ্ড্রকেয় লেখা, শরীর শ্বেত চন্দনচর্চ্চিত, মৌলী উপরে জটাজাল বিনিবদ্ধ, বদনমণ্ডল শ্মশ্রুরাজিবিশোভিত—

দেবগৃহ-স্তম্ভ গাত্রে ঝুলিয়া বিরলে
যেমতি চামর-রাজ বিকাশে শুক্লিমা।

উপমাটী অতি সুন্দর এবং সম্পূর্ণরূপে বিষয়োপযোগী। আমরা পাঠকগণকে এই সর্গ পাঠ করিতে অনুরোধ করি—সময় বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া বোধ হইবে না। যদিও ইহা কালিদাসের অনুকরণে রচিত, তবু গ্রন্থকার প্রশংসা পাইতে পারেন, এমন অনেক জিনিষ ইহাতে আছে।

তৃতীয় সর্গেও প্রসঙ্গাধীন কথা কিছু নাই—আগা গোড়া কেবল প্রাতঃকালের বর্ণনা।

চতুর্থ সর্গে রাজা দশরথের পুত্রস্বজনাদির সহিত অযোধ্যা-বর্থ্মে সোৎসব গমন। দশরথ মহা সমারোহে চলিয়াছেন, দেবগণ তাহা দেখিতে আসিয়াছেন। ইহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে—

——— ———নীরদ-নায়ক
সম্বর্ত্ত-আবর্ত্ত-দ্রোণ-পুষ্কর—এ চারি
দামিনী কামিনী, আর দীপ্ত জলধনুঃ— "

বিনা বর্ষণে জলধনুর উদয় সম্ভবে না;—মেঘ থাকিলেই যে তাহার সঙ্গে জলধনুকে থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

পঞ্চম সর্গে পরশুরামের আগমন। মহারাজ দশরথ দুর্নিমিত্ত ঘটিতে দেখিয়া বশিষ্ঠকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, কোন চিন্তা নাই, যদি কোন অশিব ঘটনার সম্ভাবনা থাকে, তাহা আমি স্বস্ত্যয়ণে নিবারণ করিব।

হেন কালে রুদ্রমূর্ত্তি পরশুরাম দেখা দিলেন। সকলে স্তম্ভিত হইল। সকলেই বুঝিল যে, এ অশিব স্বস্ত্যয়নে সারিবার নহে। ক্ষত্রিয়ললাটে না জানি কি আছে বলিয়া সকলেই প্রমাদ গণিল।

ষষ্ঠ সর্গে পরশুরাম গালিগালাজ আরম্ভ করিলেন—রাজা দশরথকে, রামচন্দ্রকে, সৈন্যগণকে, প্রাণ ভরিয়া গালি দিলেন। লক্ষণকে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই, একি? লক্ষণ বলিলেন, সীতার সঙ্গে উহার বিবাহের কথা ছিল, তাহাতে বঞ্চিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ চটিয়াছে।

সপ্তম সর্গে আবার পরশুরামের গালিগালাজ এবং আত্মশ্লাঘা। দশরথের স্তুতি, রামচন্দ্রের বিনতি—পরশুরামের কেবল কটূক্তি।

অষ্টম সর্গে লক্ষণের ক্রোধ এবং ভার্গবকে ভৎর্সনা। ভার্গব অপমানিত হইয়া মহাক্রোধে লক্ষণের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ধনুতে শরযোজনা করিলেন। এমন সময় বিশ্বামিত্র আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন, তবু তিনি সম্পূর্ণ শান্ত হইলেন না, আর সকলকে রেয়াৎ করিলেন; কিন্তু রামের সম্বন্ধে বলিলেন যে, আমার এই ধনুঃ ভঙ্গ করুক, নতুবা উহার রক্ষা নাই।

তার পর নবম সর্গে আরও কিছু কটুকাটব্যের পর পরশুরাম স্বহস্তস্থিত দুর্জ্জয় ধনুঃ বীর-দর্পে রামের হাতে দিলেন। এ দিকে সীতার বড় ভয় উপস্থিত হইল—একবার ভার্গব একখানা ধনু আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া তাঁহার সঙ্গে রামের বিবাহ হইয়াছে, আবার আজ ভার্গব সেইরূপ শরাসন আনিয়াছেন, বুঝি রামের আবার বিবাহ হয় অতএব—

কতই সপত্নী মম আছে পোড়া ভালে!

সীতার এই আশঙ্কাটুকু মন্দ নহে। সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, ইহাতে রস আছে।

দশম সর্গে ভার্গব-রাঘব-দ্বন্দ্ব অবলোকন করিতে ত্রিদিব-তলে ত্রিদশ-সমূহ সভা করিয়া বসিয়াছেন। পার্ব্বতী শঙ্করকে বলিলেন, রাম এবং ভার্গব উভয়েই আমার প্রিয়, অতএব এ দ্বন্দ্ব যাহাতে নিবারিত হয়, তাহা কর। মহাদেব ভার্গবের নিকট পদ্মাকে পাঠাইলেন। বলিয়া পাঠাইলেন,

পরাজয় অঙ্গীকারি দাশরথি কাছে
সপ্রণয়ে প্রার্থী লহ স্বর্গমার্গরোধ।

ইতিপূর্ব্বেই রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ধনুগ্রর্হণ করিয়াছিলেন। তার পর একটী শর চাহিয়া লইয়া ধনুতে যোজনা করিয়া বলিলেন—এই শরে আপনাকে বধ করিতে পারিতাম, কিন্তু ব্রাহ্মণ অবধ্য; অতএব ইহার লক্ষ্য দেখাইয়া দিন। এ দিকে পদ্মা আসিয়া ভার্গবের উপর শিবের হুকুম জারি করিয়া গেল। পরশুরাম রামচন্দ্রকে বলিলেন, আমার স্বর্গমার্গ রোধ কর। তাহাই হইল।

একাদশ সর্গে উভয় রামে প্রীতিসংস্থাপন হইল। তার পর ভার্গব সাধারণসমক্ষে ক্ষত্রবধ বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, রাঘবকে আলিঙ্গন করিলেন, ক্ষত্রবধতেজঃ সমর্পণ করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং শেষে প্রস্থান করিলেন। দশরথি

আনন্দিত হইলেন, সীতা প্রফুল্লিতা হইলেন—সকলেই উল্লাসিত হইল।

দ্বাদশ সর্গে সকলের আনন্দ, বাদ্য, নৃত্য, গীত, বন্দিবৃন্দের বন্দনাসঙ্গীতিকা, দেবগণের স্বস্থানে প্রস্থান, আকাশ-বাণী এবং গ্রন্থকারের মামুলি আত্মপরিচয়;—কাজের কথা—প্রসঙ্গাধীন কথা নাই বলিলেই হয়।

ত্রয়োদশ সর্গে সকলের অযোধ্যা প্রবেশ। এই সর্গে পথি-পার্শ্বস্থ সৌধরাজিতে পুরস্ত্রিবর্গের বিবিধ বিভ্রমবিচেষ্টা পাঠ করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের কালিদাসকে মনে পড়িবে। বাস্তবিক এই স্থলটী কালিদাসের অনুকরণ; স্থানে স্থানে অবিকল অনুবাদ।

এই খানেই কাব্য শেষ হওয়া উচিত ছিল। ইহার পর তিন সর্গ কেবল প্রকৃতিবর্ণনা এবং অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কথা। এ তিন সর্গ একবারে ছাঁটিয়া ফেলিলেও মূল কথার কোনই ক্ষতি হয় না।

আমরা সমালোচ্য গ্রন্থের যতটুকু পরিচয় দিয়াছি, তাহাতেই পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি এত বড় হইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। শেষ তিন সর্গ, দ্বাদশ সর্গ, তৃতীয় সর্গ এবং প্রথম সর্গ একেবারে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য সর্গেরও অনেক অংশ ত্যাগ করা যায়, এবং প্রত্যেক সর্গেরই শেষ ভাগ—আত্মপরিচয় এবং অনুগ্রহভিক্ষা—পরিবর্জ্জনীয়। যে সকল উপায়ে গ্রন্থকলেবর স্ফীত হইয়াছে, তদবলম্বনের অর্থ আমরা খুঁজিয়া পাই না। নিসর্গবর্ণনাতেই গ্রন্থের প্রায় চতুর্থাংশ নিয়োজিত। নিসর্গবর্ণনা মন্দ নহে, কিন্তু কেবল প্রাতঃকাল বর্ণনা করা একটা সম্পূর্ণ সর্গ গ্রন্থকারের কুরুচির পরিচায়ক, পাঠকের পক্ষে বিরক্তিজনক এবং সমালোচকের পক্ষে—মারাত্মক। তবু নিসর্গবর্ণনা কাব্যের একটা অঙ্গ বটে; কিন্তু কাব্যসূচনা বাগ্দেবতার আরাধনা, ভারতীপ্রার্থনা, কল্পনার উপাসনা, বাল্মীকির কবিজ্যেষ্ঠত্ব, কালিদাসের মহা কবিত্ব, মাইকেলের পর-

লোক, অকালমৃত্যুজন্য শোক, ভর্ত্তৃহরির স্তব, জয়দেবের মহিমাকীর্ত্তন, ভবভূতির বন্দনা,—এ সকলের দ্বারা কাব্যের যে কি উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইতে পারে, আমরা স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল খুঁজিয়া পাই না।

প্রতি সর্গের শেষেই একবার পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে "গলবসনে মুদি যোড় কর" করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে চাই যে, যিনি এত বড় একখানি কাব্য লিখিতে বসিয়াছেন, যিনি বাগ্দেবীর কাছে "কবিত্ব বিমল নভে মাধ্যন্দিন ভানুমান্" হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহার একটু আত্মাদর, একটু অহঙ্কার থাকা উচিত। নম্রতা, বিনয়, এ সকল মন্দ নহে। কিন্তু কথায় কথায় কাকুতি মিনতি করা ভাল দেখায় না। যার তার হাতে পায়ে ধরিতে গেলে সম্ভ্রম থাকে না।

গ্রন্থকার আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি মাইকেলের চেলা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি জয়দেবের চেলা। জয়দেবের সেই ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয় সমীরের ন্যায় মধুর কোমলকান্ত পদাবলী, আর গোপাল বাবুর এই দাঁতভাঙ্গা শব্দবিন্যাস তুলনা করিলে আপাততঃ এ কথায় অনাস্থা হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখিলেই ইহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হইবে। জয়দেবের ন্যায়, গোপালবাবু বিলক্ষণ কল্পনাশালী ব্যক্তি; এবং জয়দেবের ন্যায় গোপাল বাবুর কল্পনা মার্গৈকপ্রোহিত—যত কারিগরি বাহ্যজগৎ লইয়া অন্তর্জগতের উপর বড় একটা দৃষ্টি নাই। সূর্য্যরশ্মির প্রফুল্লতা, বসন্তপবনের মধুরতা, সায়াহ্ণগগনের সৌন্দর্য্য, নবকুসুমিতা লতার সৌকুমার্য্য, এ সকল চিত্রিত করিতে গোপাল বাবু বিলক্ষণ পারগ—জয়দেব অভ্রান্ত। কিন্তু প্রণয়ের উন্মত্ততা, নৈরাশ্যের কাতরতা, শৌর্য্যের মহত্ব, অনুরাগের চাঞ্চল্য, এ সকল চিত্রিত করিতে গুরুশিষ্য কাহারও তুলি চলে না। জড়জগতের ভীম ভঙ্গী সকল চিত্রিত করিতে জয়দেব চেষ্টা করেন নাই; গোপাল বাবু চেষ্টা

করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। জয়দেব আত্মশক্তি বুঝিতেন, গোপাল বাবু হয়ত বুঝেন না;—জয়দেব গুরু, গোপাল বাবু চেলা। অন্তর্জগতের উপর দৃষ্টি না থাকিলেও বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে লেখকের বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে এবং নিসর্গসৌন্দর্য্য তিনি প্রেমিকের চক্ষে দেখেন—যে চক্ষে ওয়ার্ডসওয়ার্থ দেখিতেন, সেই চক্ষে গোপাল বাবু দেখেন—অনেক ভঙ্গী, যাহা অপ্রেমিকের চক্ষে পড়ে না, গোপাল বাবুর চক্ষে পড়ে এবং তিনি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যায়েন—শত মুখে, সহস্র মুখে তাহা ব্যক্ত করেন। সামান্য কথা লইয়া কেন এত আড়ম্বর, তাহা প্রেমিক যে, সে বুঝিবে—সকলে বুঝিবে না।

অন্তর্জগতের উপর দৃষ্টি না থাকিলে যে দোষ ঘটে, তাহা এই গ্রন্থেও ঘটিয়াছে—একটা চরিত্রও উত্তমরূপে সংরক্ষিত হয় নাই। দশরথকে দেখ। যখন ভার্গব সেই দুর্জ্জয় কার্ম্মুক রামচন্দ্রের হস্তে দিলেন, তখন রাজা দশরথ পুত্রবিয়োগাশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইলেন—অনেক বিলাপ করিলেন—শেষে মূর্চ্ছা গেলেন। রাজা দশরথ স্বয়ং বীর পুরুষ, তাঁহার মূর্চ্ছা যাওয়া ভাল হয় নাই। একটু ভয়, একটু আশঙ্কা, হয় হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু মূর্চ্ছাটা বড় অসঙ্গত। রামায়ণের দশরথ মূর্চ্ছিত হয়েন নাই।

আবার পরশুরামকে দেখ। ভার্গব-বিজয়ের পরশুরামকে দেখিয়া আমাদের সেই চিরপরিচিত পরশুরাম বলিয়া চিনিতে পারিলাম না। রামায়ণের পরশুরাম,—মহাবীর, মহাতপস্বী, উন্নত-চিত্ত, প্রশস্তহৃদয়। তিনি যখন ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া সিংহনাদ করেন, তখন সুরাসুর কম্পিত হয়, বায়ু স্তম্ভিত হয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ পথ হারা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আর গোপাল বাবুর পরশুরাম—যদি বিশেষণ পদ দ্বারা তাঁহার চিত্র আঁকিতে হয়, তবে এইরূপ লিখিতে হয়—কুভাষী, অভদ্র, মুখ-সর্ব্বস্ব, দাম্ভিক, নির্লজ্জ, অসার, দুর্বিনীত এবং অব্যবস্থিতচিত্ত।

তিনি যখন আত্মবীর্য্য খ্যাপন করেন, আমাদের হাসি পায়—যখন দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করেন, পড়িতে লজ্জা হয়। বীরের মুখে, ঋষির মুখে তেমন কথা আসে না। রামচন্দ্রের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা ভদ্র লোকের অব্যবহার্য্য।

কোথা সেই নরাধম, দে শীঘ্র দেখায়ে,—
ধূরত জম্বুক সম ভয়ে দূরে গেল
লাঙ্গুল গুটায়ে, পাপ!

রামায়ণের পরশুরামে এরূপ ইতরতা নাই। তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে যেরূপ সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাহা বীরের ন্যায়, মহতের ন্যায়, পরশুরামের ন্যায়—দূরশ্রুত জলদনিনাদের ন্যায় ধীর, গম্ভীর এবং ভয়ঙ্কর—

রাম! দশরথে! বীর! বীর্য্যংতে শ্রুয়তেঽদ্ভুতং।
*   *   *   *
তদিদং ঘোরসঙ্কাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ।
পূরয়স্ব শরেণৈব স্ববলং দর্শয়স্ব চ॥
তদহং তে বলং দৃষ্ট্বা ধনুষোঽপ্যস্য পূরণে।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্য্যশ্লাঘ্যমহং তব॥

রসাবতারণায় আমাদের কবি সকল স্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার রসে সজীবতা নাই। পরশুরাম আসিয়া বীর রসের কত কথাই বলিলেন, তিন সর্গ ব্যাপিয়া বীরদর্পে বীরবাক্য কতই উচ্চারিত করিলেন, কিন্তু এত বীররসের মধ্যে আমাদের এক বিন্দুও শোণিত উষ্ণতর হইল না—পড়িতে পড়িতে একবারও আমাদের রোমাঞ্চ হইল না, একবারও একটু উৎসাহ অনুভব করিলাম না। আবার সীতা যখন পীরিতের ফাঁদ পাতিয়া বলিতে লাগিলেন,

জগতে তোমার সনে মিলেনা তুলনা,
তোমার উপমা, দেব, তুমিই ভুবনে।

তোমার বিক্রম সাজে তোমার বিক্রমে ;
তোমার বদন যেন তোমার বদন ;
তোমার নয়ন; নাথ, তোমার নয়ন ;
রামের সুতনু সম রামের সুতনু !

তখন আমরা কোন রূপ কোমলতা অনুভব করিলাম না। কেমন বোধ হইল, যেন এ কথাগুলি সীতা বাড়ী হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছিলেন, এতক্ষণ সময় প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া বলা হয় নাই— বোধ হইল যেন "তোমার তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" এই গীতটী সীতা জানিতেন, সময় পাইয়া তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ, সুতরাং হাল আইনানুসারে, পরিশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত।

নিসর্গবর্ণনার অবতারণাতেও স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়াছে। কোথাও উপমা সংযোজনে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—তৃতীয় সর্গের প্রথম পাঁচ ছত্র ইহার প্রমাণ। আমাদের কবি একই নিশ্বাসে সূর্য্য-দেবকে একবার "প্রাচীদিক্ অধীশ্বরীর সীমন্ত মুকুট হৈম শিখা-মণি" বলিয়াছেন, আবার "জগৎ লোচন" বলিয়াছেন, পুনরায় আবার তাঁহারই গলে "সমুজ্জ্বল মালা" দোলাইয়াছেন। তবে মালার সম্বন্ধে এই এক কথা আছে যে, উহা জগৎলোচনের গলে, কি দিক্ অধীশ্বরীর গলে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না কোথাও বা অলঙ্কার দোষ ঘটিয়াছে—

———"বিমণ্ডিত
কুসুম-স্তবক ভারে"

যাহার দ্বারা বিমণ্ডিত হওয়া যায়, তাহাকে ভার বলা ভাল হয় নাই। এক আধ স্থলে অশ্লীলতা দোষও ঘটিয়াছে—দৃষ্টান্ত, ১৫৯—১৭০ ছত্রদ্বয় এবং ২৩৫—২৩৮ ছত্র চতুষ্টয়, তৃতীয় সর্গ। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে "শাবগণ সনে" থাকায় কিঞ্চিৎ হাস্যজনকও হইয়াছে

স্থানে স্থানে উপযোগিতা রক্ষিত হয় নাই। তপোবন বর্ণনায় এক স্থলে লিখিত হইয়াছে,

বাজিছে বিবিধ বাদ্য সংগীত সংহতি
মুরজ মন্দিরা বীণা মুরলী রসাল ;

আবার, অন্য স্থলে, তপোবনস্থ লতাপাদপ মৃদু পবনে দুলিতেছে—কেমন ?—

লাসিকা ললনা যথা লাস্য লীলা করে।

তপোবনে মুরজ মন্দিরা প্রভৃতির ধ্বনি, তপোবন বর্ণনায় উপরি উদ্ধৃত উপমার সমাবেশ বড় অসঙ্গত হইয়াছে—অশ্বমেধ যজ্ঞে যেন খেমটার নাচ হইয়াছে, দেবর্ষি নারদ যেন চাবির শিকল পরিয়াছেন। আমরা একবার যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলাম, নকীব শ্যামা বিষয়ক গান গাইতে গাইতে 'স্বজনি লো' বলিয়া রাগিণী টানিয়াছিল, তাহা আমাদের মনে পড়িল।

গ্রন্থের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পরিলাম না। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ বুঝা সুকঠিন। যাঁহারা অল্প সংস্কৃত জানেন, তাঁহাদিগকেও পাঠ কালে বোধ হয় একখানি অভিধান কাছে করিয়া বসিতে হইবে। এরূপ দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য, ক্লেশোচ্চার্য্য শব্দ সন্নিবেশ করিলে গ্রন্থের সাধারণ্যে আদর হয় না। তরুণেরা কিছু শব্দাড়ম্বরপ্রিয় হইয়া থাকেন, কিন্তু এ গ্রন্থে বড় বেজায় বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন রচনার উপাদেয়তা অনেকটা নষ্ট হইয়াছে—"এনীশাবলেখাহীন হিমধামাননা" না বলিয়া যদি "অকলঙ্ক শশিমুখী" বলিতেন, আমরা পরম আপ্যায়িত হইতাম।

ভাষার এই জটিলতা কিয়ৎপরিমাণে অলঙ্কারপ্রিয়তার ফলও বটে—অনুপ্রাস এবং মালোপমার দায়ে অনেক স্থান দুরধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে অলঙ্কারাধিক্যনিবন্ধন ভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পায় নাই—সোণা রূপার ভারে সংকুচিত, জড়সড়, কাতর,

অর্দ্ধ-লুক্কায়িত, নির্জ্জীব ভাবে রহিয়াছে। গ্রন্থকারকে এই বলিতে চাই, যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত সোণা রূপায় ঢাকিয়া দেওয়া অপেক্ষা একখানা জড়াও গহনা ভাল—সুন্দর, সুরুচির পরিচায়ক, মূল্যবান এবং সম্ভ্রান্ত। কিন্তু এ বয়সের দোষ, বয়সে সারিয়া যাইবার সম্ভব।

গ্রন্থকার কল্পনাশালী ব্যক্তি বটেন। ভার্গববিজয়ের অনেক স্থলে তাহার পরিচয় আছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা রাঘববৈবাহ লক্ষ্মীর বর্ণনার উল্লেখ করিতে পারি—ইহা নির্দ্দোষ না হইলেও সুন্দর বটে। গ্রন্থকারের কবিত্বও বিলক্ষণ আছে; তবে কি না, যাহা বলিয়াছি তাই—এক তরফা; দৃষ্টি কেবল বাহ্য জগতের উপর, অন্তর্জ্জগতের সঙ্গে ভাল পরিচিত নহেন। যাহাই হউক, গোপাল বাবু জয়দেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য বটেন, সন্দেহ নাই।

অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনায় গোপাল বাবুর বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে; তবে দুই এক স্থানে যে নিতান্ত গদ্যের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে তাহা মার্জ্জনীয়। গ্রন্থকার যে তরুণবয়স্ক এবং ভার্গববিজয় যে তাঁহার কবিত্বতরুর প্রথম ফল, তাহা যে কেহ গ্রন্থখানি পড়িবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের নবীনত্ব বিবেচনা করিলে আমরা আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি বলিতে হইবে। তাঁহার রচনার গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, এবং অবিচলিত ধীরাগতির আমরা প্রশংসা করি এবং ভরসা করি, গ্রন্থকার অনতিবিলম্বে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ সমালোচনার্থ আমাদের হাতে অর্পণ করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

বাঙ্গালির জন্য নূতন ধর্ম্ম।

কোমৎ বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকই দেবতা, স্ত্রীসেবাই ধর্ম্ম, আমরা বাঙ্গালি, প্রাণের সহিত বলিয়াছি—তথাস্তু। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোমৎ পূজার পদ্ধতিটা ভাল করিয়া বিবৃত করেন নাই। আমরা বাঙ্গালী—চিরকাল পৌত্তলিক—পৌত্তলিকতা আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—শুদ্ধ আধ্যাত্মিক উপাসনায় আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমরা শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইব, ধূপ ধূনা জ্বালিব, দান ধ্যান করিব, স্তব স্তুতি করিব; পুরোহিত মন্ত্র বলিবে, যজ্ঞের অনল জ্বলিয়া উঠিবে, আঙ্গিনায় ঢাক ঢোল বাজিবে, হাড়কাঠে ছাগ ব্যা ব্যা করিবে, নতুবা কেমন যেন অঙ্গহীন হইল বলিয়া বোধ হয়। কোমৎ ধর্ম্মের এই অভাব আমি আজি পূর্ণ করিব। অমিত-শক্তি কোমৎ পৃথিবীর পাঁচটী সুসভ্য জাতির জন্য যে ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন, ক্ষুদ্র শক্তি আমি পৃথিবীর একটী অর্দ্ধসভ্য জাতির জন্য সেই ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড প্রকাশ করিব।

পূজার উপকরণ। অশ্রুজল এবং দীর্ঘশ্বাস এই পূজার পাদ্য অর্ঘ; স্বর্ণালঙ্কার এ পূজার পুষ্প; সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা ইহাতে হাড়কাঠ; উপাসকের প্রাণ তাহাতে ছাগ; সোহাগ খর্পর; ভালবাসা কামার; ঢাকাই সাড়ি ইহাতে বিল্বপত্র; ফ্রেঞ্চ পারফিউমারি তাহাতে চন্দনের ছিটা; প্রতি শনিবারের রাত্রি এ পূজার মহা অষ্টমী। পুরোহিত যৌবন।

যজ্ঞ। যজ্ঞকালে পুরোহিত যৌবন মহাশয় উপাসকের প্রাণ সমিধে মোহের আগুণ লাগাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ তন্ত্র হইতে মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দিবেন—"মান ভাঙ্গিতে নিদ্রা স্বাহা"—"কথা রাখিতে ভ্রাতৃ বন্ধন স্বাহা" "অলঙ্কার ও সাটি কিনিতে যথা সর্ব্বস্ব স্বাহা"—"পাঠের জন্য নাটক কিনিয়া দেশীয় সাহিত্য স্বাহা"—"মন রাখিতে ইহলোক পরলোক স্বাহা"—ইত্যাদি।

স্তুতি। সংসার গগণে তুমি ব্যোমযান—কথায় কথায় কথায় আকাশে তোল; আবার যখন ফেলিয়া দেও, তখন সমুদ্রগর্ভে অথবা পর্ব্বতশৃঙ্গে হাবু ডুবু খাইতে হয়, অথবা হাড় চূর্ণ হইয়া যায়। জীবনের পথে তুমি রেলের গাড়ি—যখন রসনারূপ এঞ্জিনে ফুল ফোর্স দেও, তখন এক দণ্ডের মধ্যে চৌদ্দ ভুবন দেখাও। কার্য্যক্ষেত্রে তুমি ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ—কথাটী পড়িলে নিমিষের মধ্যে তাহা দেশ দেশান্তরে চালাইয়া দেও। ভব নদীর তুমি নৌকা—অধমকে পার কর।

তুমি ইন্দ্র—শ্বশুরকুলের দোষ দেখিতে তুমি সহস্র চক্ষু; স্বামীর শাসনে তুমি বজ্রপাণি; তোমার থাকিবার স্থান অমরাবতী—যেখানে তুমি সেই স্বর্গ। তুমি চন্দ্র। তোমার হাসি কৌমুদী—তাহাতে মনের অন্ধকার দূর হয়। তোমার ভালবাসা অমৃত—যার অদৃষ্ট ঘটে তার সশরীরে স্বর্গভোগ। আর লোকে যে অনর্থক বলে তুমি পরাধীন, ঐ টুকু তোমার কলঙ্ক। তুমি বরুণ, কেন না, মনে করিলেই জলে মাটী ভিজাইতে পার। তোমার চক্ষের জল; দেখাদেখি আমরাও গলিয়া জল।

তুমি সূর্য্য—উপরে আলোকের আবরণ, ভিতরে অন্ধকার বাষ্প। একদণ্ড চক্ষের বাহির হইলে দশদিক অন্ধকার দেখিতে হয়। আবার যখন মাথায় উঠ, তখন আজ্ঞান করিয়া মরি—দেশ ছাড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা করে।

তুমি বায়ু—জগতের প্রাণ। তোমা ছাড়া হইলে কতক্ষণ বাঁচি? একদণ্ড তোমার দেখা না পাইলে প্রাণ ছটফট করে, জলে ঝাঁপ

দিতে ইচ্ছা করে; আবার যখন প্রখর বহ, কার বাপের সাধ্য তোমার সম্মুখে দাঁড়ায়? তুমি যম—বেড়াইয়া আসিতে রাত হইলে। তোমার বক্তৃতা নরক—সে যন্ত্রনা যাহাকে সহ্য করিতে না হয়, সে পুন্যবান্—তার অনেক তপস্যা।

তুমি অগ্নি, কেন না দিবানিশি আমাদিগকে হাড়ে হাড়ে পোড়াইতেছে।

তুমি বিষ্ণু। তোমার নাশিকার নথ তোমার সুদর্শন চক্র—উহারই ভয়ে পুরুষ অসুরগণ মাথা গুঁজিয়া তটস্থ হইয়া থাকে। একমন একচিত্তে তোমার সেবা করিলে সশরীরে গো-লোক প্রাপ্তি হয়।

তুমি ব্রহ্মা। তোমার মুখ দিয়া যাহা বাহির হয় তাহাই আমাদের বেদ—অন্য বেদ আমরা মানিনা—ঋক্, যজু, সাম, অনেক দিন হইল বৈতরণী পার করিয়াছি।

তুমি নীলকণ্ঠ, কেননা তোমার কণ্ঠ ভরা বিষ—অন্ততঃ দরিদ্রের ভাগ্যে। পরনিন্দায় তুমি পঞ্চমুখ। স্ত্রীস্বাধীনতা বাদীরা তোমার দলবল, অতএব তুমি ভূতনাথ।

তুমি লক্ষ্মী—তুমি যার ঘরে নাই, সে লক্ষ্মীছাড়া। তুমি ধনের দেবতা—প্রধান আচার্য্য ম্যালথস্ আইন জারি করিয়াছেন, যার টাকা নাই সে যেন তোমার উপাসনা করিতে না আসে।

তুমি সরস্বতী—বোধোদয় এবং পদ্মাবলী পড়িয়াই। বহু আরাধনায় তোমায় লাভ করিতে হয়, বহু সেবায় রাখিতে হয়।

তুমি মহামায়া, কেন না অত মায়া আর কেহ জানে না। পরচ্ছিদ্র দর্শনে তুমি ত্রিনয়নী। শরীর সজ্জার উপকরণ গ্রহণে তুমি দশভুজা। শান্তিপুরের প্রসাদে তুমি দিগম্বরী।

তুমি শ্যামা। কেন না স্বামী, তোমার পদতলে। তোমার সাধনায় অনেক ভূত প্রেতিনীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয়—

বাসর ঘরের প্রেতনীদিগের দৌরাত্ম্যের কথাটা মনে পড়িলে এ বৃদ্ধবয়সেও হৃৎকম্প শিরঃশূল নূতন করিয়া উপস্থিত হয়।

তুমি শ্রীকৃষ্ণ, কেন না এই সংসারগোষ্ঠে পুরুষ গরুদিগকে চরাইয়া লইয়া বেড়াও। সারাদিন চরাইয়া সন্ধ্যাকালে দুটি ঘাস জল দিয়া গোয়ালে বন্ধ কর। সহজে না গেলে, নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া যাও।

তুমি জগন্নাথ—তোমার জুরিস্‌ডিক্‌সনের মধ্যে জাতিভেদ নাই; ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, জোলা সব একগোত্র। জগন্নাথের হাত নাই; বঙ্গদেশে তোমারও কিছুতে হাত নাই।

তুমি গয়া—কত লোকের পিণ্ডই যে তোমাতে মর্দ্দিত হইয়াছে তার সীমা নাই। তুমি কাশী—পৃথিবীর ধর্ম্মের ষাঁড় তোমাদের চেলা।

তুমি বসন্ত—মিলনে; তখন হৃদয়োদ্যানে কত ফুল যে ফুটে, কত বায়ু যে বহে, কত ভ্রমর গুঞ্জরে, কত কোকিল কুহরে—সুখের স্পর্শে অনুক্ষণ পুলক পূর্ণ। তুমি গ্রীষ্ম—বিরহে; সদাই আগুন, ছটফট, জ্বলে মরি, বাতাস দে, নির্জীব, নিরুৎসাহ, অলস, অবশ—প্রাণটা হুহু করে, পৃথিবীটা খাঁ খাঁ করে, যেন প্রলয় উপস্থিত। তুমি বর্ষা—রোগে, হৃদয়াকাশ সদা মেঘাচ্ছন্ন, নয়নজলদ সদা জলভারাকীর্ণ এবং বর্ষণোন্মুখ—একবার বর্ষে, তখনই ধরে, আবার তখনই বর্ষে—সর্ব্বদা আশঙ্কা, কখন কি হয়। তুমি শীত—রাগে; জড়সড়, কম্পযুক্ত, পেটের ভিতর হাত পা ঢুকিয়া যায়, দাঁতে দাঁতে লাগে; শীতে কেবল আহারের সুখ, তুমি যে দিন রাগে থাক সে দিনও বটে—দুইজনের ভাগ একার হয়। তুমি শরৎ—প্রার্থনায়; যখনই তোমার দিকে চাহিয়া দেখি যে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ প্রকাশ, শশধর ষোল কলায় হাসিতেছে, খঞ্জনচকোর নাচিতেছে, তখনই বুঝিতে পারি, আজ বুঝি কিছু আবদার আছে, নহিলে এত রূপের ছড়াছড়ি, সোহাগের এত বাড়াবাড়ি!

তুমি বেদ—তোমার কথাই সকল ধর্ম্মের উপর ধর্ম্ম। তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র—মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত প্রভৃতিকে তামাদি করিয়া তুলিয়াছি, এখন তোমার বিধানমতেই চলিব। তুমি তন্ত্র—উচ্ছনের মূলমন্ত্র। তুমি পুরাণ—অধিকাংশই বাজে কথা, অনেক মিথ্যা কথা, কাজের কথা খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তুমি সাংখ্য—প্রকৃতিই মূল তত্ত্ব। তুমি বেদান্ত—সব মায়ার মোহ। তুমি ন্যায়—অন্ততঃ কলহ-পটুতায়। তুমি পাতঞ্জল—তোমা বৈ আবার যোগ কি? তুমি মীমাংসা—তা কেবল দর্শন বলিয়া কেন, দর্শনে, স্পর্শনে, আস্বাদান, তুমি যা বল তাই নিষ্পত্তি, যে আপত্তি করে তার কম্বক্তি।

তুমি ক্ষিতি, কেননা প্রকৃত পক্ষে তুমিই বসুন্ধরা—যে হাসি হাস, যে কথা কও, যে চাহনি চাও, কুবেরের ভাণ্ডার বেচিয়া দিলেও তার মূল্য হয় না। তুমি অপ, কেন না তুমি তরলমতি। তুমি তেজঃ—বালিকাবিদ্যালয়ের প্রসাদাৎ। তুমি মরুৎ, কেন না শব্দ বহন করা তোমার ধর্ম্ম। তুমি ব্যোম—কত রঙ্গেই যে থাক তার ঠিকানা পাই না।

এ স্তবটা হিন্দুমতে হইল। ব্রাহ্মেরা হয় ত তজ্জন্য কিঞ্চিৎ মনক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু আমরা কাহাকেও বঞ্চিত করিব না; ব্রাহ্ম-মতেও একটা স্তোত্র দিতেছি। আমার ইচ্ছা সকলকেই অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাই; চক্ষুর দোষে যদি কাহারও আলো আঁধারি লাগে, আমি কি করিব? স্তোত্র যথা,—

হে সর্ব্বময়ি, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নিরন্তর তোমার অপার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতেছে। বায়ুর সৃষ্টি তোমার গ্রীষ্ম দূরীকরণ করিবার জন্য; মৃত্যুর সঞ্চার তোমার মাথার উকুন মারিবার জন্য; সূর্য্যের উদয় তোমার ভিজা কাপড় শুকাইবার জন্য; চন্দ্রের বিকাশ তোমার শোবার ঘরের বারান্দায় বাঁধা রোশনাই করিবার জন্য; ফুল ফুটে, তুমি খোঁপায় পরিবে বলিয়া; ফল পাকে, তুমি শ্রীউদরে দবে বলিয়া; হে পরম সৎ, আশীর্ব্বাদ কর, রাত্রে যেন সুনিদ্রা হয়।

তুমি অনন্ত, কেন না তোমার অন্ত পাওয়া ভার। তুমি সর্ব্বশক্তিমতী, কেন না তুমি না করিতে পার হেন কর্ম্ম নাই। তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং, কেন না তোমার যোড়া নাই—হে সশরীরে মুক্তি প্রদায়িনি, পাপীর অপরাধ লইও না, আমি কথায় কথায় অনুতাপ করিব ;—অনুতাপ আমি খুব করিতে পারি, এক প্রকার সিদ্ধবিদ্য বলিলেই হয়।

তুমি সত্যস্বরূপ, কেন না তোমা বৈ সব মিথ্যা। তুমি যে অমৃতস্বরূপ তাহা আর বলিতে হইবে কেন? তুমি অতি গুরু—নতুবা লোকে ভূতের বোঝা বলিবে কেন? তুমি অতি হালকা—প্রমাণ, পেটে কথা থাকে না। তুমি অপরিসীম—উদর সম্বন্ধে। তুমি মনুষ্য বুদ্ধির অতীত—হে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনি, হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনি, অধমের অপরাধ হইলে রাগ করিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিও না—আমি খাটের পাশে দাঁড়াইয়া থতমত খাইব, মাথা চুলকাইব, আর আঁ্যা আঁ্যা করিব। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

সমাপ্ত।